"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com
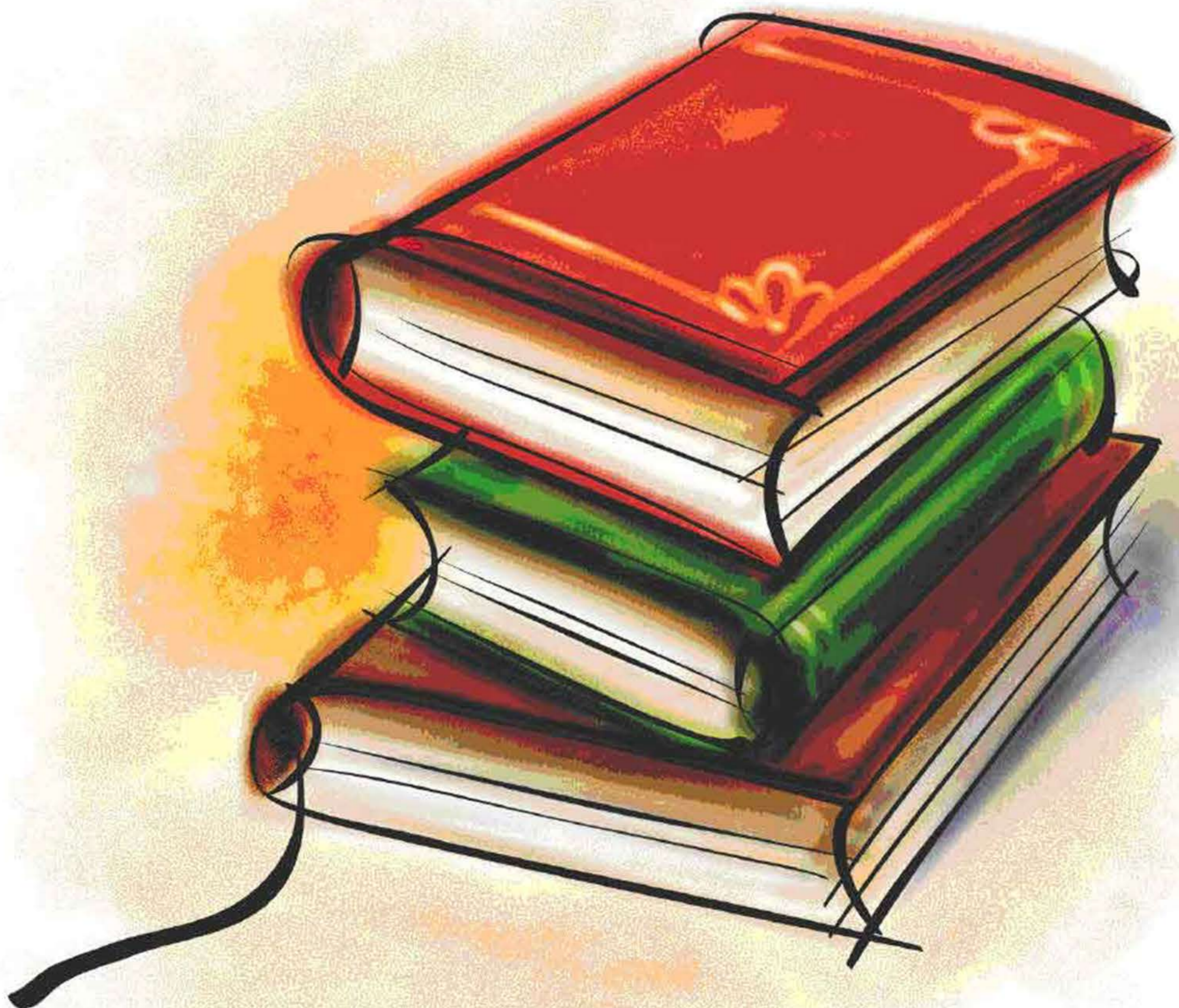
বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

১.	রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচিতি ১ম : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	:	১৫.০০
২.	আধুনিক ওড়িয়া কাব্যধারা : নরেন্দ্রনাথ মিশ্র	:	৪২.০০
৩.	রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন : সান্ত্বনা মজুমদার		২৩.০০
৪.	স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য : পশুপতি শাসমল	.	৩৫.০০
৫.	উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা : যোগীরাজ বসু	:	৩.০০
৬.	শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা : উপেন্দ্রকুমার দাস		৫০.০০
৭.	চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা : ভি. ভি. ওয়াজেলওয়ার	:	১২.০০
৮.	অশ্বঘোষ : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	.	৬০.০০
৯.	রসচন্দ্রিকা : শিবনারায়ণ ঘোষাল		৪২.৫০
১০.	রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা : নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	:	১২.৫০
১১.	এ স্টাডি অব দি ইউনিভারস্যাল : সুশান্ত সেন	:	
১২.	ল্যাংগুয়েজ স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড মীনিং : স্বপ্না সেনগুপ্ত	:	৪৬.০০
১৩.	আর্বান গ্রোথ ইন রুর্যাল এরিয়াজ চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	:	৫১.০০
১৪.	প্রবলেম্স অব ল্যাণ্ড ট্রান্সফার : করুণাময় মুখোপাধ্যায়	:	১০.০০
১৫.	টেগোর্স এডুকেশনাল ফিলসফি : সুনীলচন্দ্র সরকার	:	৭.৫০
১৬.	ফিলসফি অব শ্রীমদ্ভাগবত : সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য	:	৪২.০০
১৭.	দি সরূপ ইন ইণ্ডিয়া : সুধাকর চট্টোপাধ্যায়	.	৮.০০
১৮.	চর্যাগীতিকোষ : প্রবোধচন্দ্র বাগচী	:	৬.০০

গবেষণা প্রকাশন সমিতি

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

২৬শে জানুয়ারী

তিনটি স্মৃতিপূত দিনের বার্ষিকীর স্মারক

এই দিনটিতে, ৪৯ বছর আগে, আমরা পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের সংকল্প ঘোষণা করেছিলাম।

এই দিনটিতে, ১৯৫০ সালে, আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করেছিলাম এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সম অধিকার ও সৌভ্রাত্রের আদর্শে মহান এক সংবিধান নিজেদের হাতে অর্পণ করেছিলাম।

দু' বছর আগে, প্রায় এই দিনটিতেই, আমরা সংবিধানে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুত পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা শুরু করেছিলাম।

আসুন এই বার্ষিকী অর্থবহ করে তুলতে—

আমাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য
কৃতজ্ঞতা জানাই

মুক্তি ও সাম্যের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন
তাঁদের স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী হই

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়
যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তব করে তোলার জন্য
নিজেদের আবার-উৎসর্গ করি

—

উত্তরসূরি
উত্তরসূরি সুকুমার সেন কে নিবেদিত সংখ্যা

১০১ তম। কার্তিক পৌষ ১৩৮৫ । ২৬ বর্ষ ১ম

●

সুকুমার সেনের প্রতিকৃতি

প্রবন্ধাবলী

সাক্ষাৎকার

জীবন-পঞ্জী

গ্রন্থ-পঞ্জী

●

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরি কার্যালয় : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৭০০০৫০

ডঃ সুকুমার সেন

‘আমি কলকাতায় দ্বিজ’

সুকুমার সেন

[উত্তরসূরির এই বিশেষ সংখ্যার জন্য উত্তরসূরির পক্ষ থেকে ডঃ সুকুমার সেনের সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাসভবনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড নির্মল দাশ। সাক্ষাৎকারের সময় ৮ নভেম্বর ১৯৭৮, সকাল ৯-৩০—১১-১৫।]

প্রশ্ন॥ ভাষাতত্ত্বে আপনার আগ্রহ হলো কী করে? সাধারণ ভাবে লোকে তো বিষয়টা এড়িয়ে যেতেই চায়।

সুকুমার সেন॥ ছেলেবেলায় বাবা আমাকে নেসফীল্ডের একখানা পাতলা এলিমেণ্টারি ইংরেজি গ্রামার এনে দিয়েছিলেন (বইটা এখন আর দেখি না), সেটা খুব মন দিয়ে পড়তুম। ফলে পরীক্ষাতে ইংরেজি ব্যাকরণে নম্বরও পেতুম অনেক। আমার এক মাস্টার মশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু খুব স্নেহ করতেন আমাকে, পরীক্ষায় ইংরেজিতে অনেক নম্বর পেতুম বলে তিনি উঁচু ক্লাসের ছেলেরা ইংরেজি গ্রামার না পারলে আমাকে নীচু ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে তার উত্তর দিতে বলতেন। আমি উত্তর দিতে পারলে উঁচু ক্লাসের ছেলের কান মলে দিতে বলতেন। কান তো আর মলতুম না (হাজার হোক উঁচু ক্লাসের ছেলে।), চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতুম। কিন্তু ঐখান থেকেই ব্যাকরণের দিকে আমার আকর্ষণ বাড়তে থাকে। তাছাড়া, ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে সংস্কৃতচর্চায় পরিবেশ—গীতা-চণ্ডীপাঠের আয়োজন আমাকে সংস্কৃতের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। এ ছাড়া, বাড়িতে চারু বসুর ধম্মপদ ছিল, তাতে

অনুবাদের সঙ্গে মূল পালি Text-ও দেওয়া ছিল। খুব ছেলেবেলাতেই বইখানা অনেকবার পড়েছি, ফলে পালি ভাষার সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল খুব ছেলেবেলাতেই। এরপর থার্ড ক্লাসে উঠলে বাবা চাইলেন আমি সংস্কৃতে আগু-মধ্য পরীক্ষা দিই। পরীক্ষা অবশ্য দেওয়া হয় নি, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় হলো ব্যাপক ভাবে। এর পরের ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় পেলুম G Thibaut-এর Elementary Grammar of Sanskrit—ইংরেজি মডেলে লেখা আধুনিক সংস্কৃত ব্যাকরণ। এখান থেকে ব্যাকরণচর্চার একটা মডেল পেয়ে গেলুম। ম্যাট্রিক পাশ করলুম ১৯১৭ সালে। ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে গিয়ে অঙ্কের দিকে ঝোঁক গেল। ক্লাসে গণিতশাস্ত্রের অনেক কূটতত্ত্ব তুলতুম। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ইচ্ছে হল ম্যাথেম্যাটিকসে অনার্স নিয়ে পড়ব। গেলুম বাকুড়ার ক্রিশ্চিয়ান কলেজে, প্রিন্সিপ্যাল সাদরে আহ্বান করলেন। কিন্তু হোস্টেলে জায়গা নেই। থাকব কোথায়? কাজেই কলকাতায় চলে এলুম। কলকাতায় আমার মামার বাড়ি। প্রেসিডেন্সি কলেজে খোঁজ নিয়ে জানলুম ওখানে ভর্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। একজন বললেন, মেট্রোপলিটান কলেজে তার যোগাযোগ আছে। ওখানে ভর্তির ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু আমার ইচ্ছে সরকারী কলেজে পড়ব। তখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ বাদে আর সরকারী কলেজ—সংস্কৃত কলেজ। সংস্কৃতে অনার্স আর ফিলজফি কম্বিনেশান নিয়ে ভর্তি হলুম সংস্কৃত কলেজে। এই সময় একজন নতুন অধ্যাপক—নাম বীরেশচন্দ্র আচার্য—তিনি অনার্সে বেদ পড়াতেন। এত চমৎকার পড়াতেন যে বৈদিক সাহিত্যে আমি একেবারে নিবিষ্ট হয়ে গেলুম। অনার্স সহ বি. এ. পাশ করার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এম এ-তে কোন গ্রুপ নিয়ে পড়বে? আমি বললুম, আমি সংস্কৃতে এম এ পড়ব না। পড়ব Comparative Philology-তে। তিনি খুশী হয়ে আমাকে ঐ বিভাগের অধ্যাপক তারাপোরেওয়ালার কাছে নিয়ে গেলেন। তিনিও সানন্দে আমায় ভর্তি করে নিলেন। এম এ-তে ২০০ নম্বরের থিসিস লিখতে হয়েছিল। আমার বিষয় ছিল Noun Syntax in Vedic Prose। পরীক্ষক ছিলেন তিনজন—অধ্যাপক তারাপোরেওয়ালা। সুনীতিবাবু আর এস. কে. বেলভালকার। নম্বর পেয়েছিলুম ৯৬%। এর পরের বছরই পি আর. এস পেলুম। বিষয়

ছিল **Syntax of Vedic Prose**। এই সময়ের একটা স্মরণীয় কথা বলি। সেটা ১৯২৪ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের কর্মচারী ভূপেন্দ্রলাল বসু আমাকে একদিন কথায় কথায় বললেন যে সুনীতিবাবু আমার থিসিসের খুব প্রশংসা করেছেন, আমি তার সঙ্গে দেখা করছি না কেন? তখন সিনেট হলের পেছনে লম্বা টালির ঘরে ছিল University Press। ঐ প্রেসে তখন ODBL ছাপার কাজ চলছিল। সুনীতিবাবু প্রায়ই তখন ছাপার কাজ দেখতে ছুটির পর সেখানে যেতেন। আমি একদিন সেখানে গিয়েই তার সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি আমাকে একদিন ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইনি যে বিষয়ে থিসিস করেছেন তার একাংশ মাত্রের উপর কাজ করে P D Gune জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়েছেন, ইনি তার চেয়েও অনেক বিস্তৃতভাবে কাজ করেছেন। এঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিলেত পাঠাতে হবে। স্যার আশুতোষ প্রথমে মৃদু আপত্তি করে পরে রাজি হলেন। কিন্তু এই ঘটনার ৩ মাস পরেই তিনি গত হলেন, আমারও আর বিলেত যাওয়া হল না। সেই যে গেলুম না, আর কখনোই আমার বিদেশে যাওয়া হল না। তবে এর জন্য আমার মনে কোন দুঃখ নেই। বরং একটু গর্বই আছে। আমি তো সব জায়গাতেই বলি, I am a home-made scholar—বিদ্যাচর্চার জন্য আমাকে কখনো দেশ ছেড়ে বাইরে যেতে হয় নি। তবে, হ্যাঁ, একটিবার আমি বিদেশে গিয়েছিলুম—সে কোথায় জানো? সেই ১৯৫১ সালে একবার ধুবড়ি গিয়েছিলুম ভায়া ঈস্ট পাকিস্তান—সে-ই আমার বিদেশদর্শন। ঐ বিদেশভ্রমণ আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ জীবনে ঐ প্রথম সাড়া ব্রিজ দেখলুম।

প্রশ্ন॥ আজকাল যে নতুন রীতির ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

সুকুমার সেন॥ ছ্যাগো, ১৯৫৩ সালে পুনার ডেকান কলেজের সেমিনারে গিয়ে শুনলুম, আমরা যে রীতিতে ভাষাতত্ত্বচর্চা করছি তার চেয়ে নতুন রীতির চর্চা নাকি আমেরিকায় শুরু হয়েছে। তা সেটা নতুন কোথায়? যুদ্ধের সময় আমেরিকার War Department-এর একটা প্রোগ্রাম ছিল খুব অল্প সময়ে সেনাবিভাগের লোকদের অচেনা ভাষা শিখিয়ে দেওয়া—ওরা ভাষার ইতিহাসের

দিকে তাকালো না—শুধু ভাষার ওপর ওপর পরিচয়। এ বিদ্যার মূল্য কী? এটা কেমন জানো? যেন অ্যালজেব্রা শিখেও শুভঙ্করীর নিয়মে সহজে অঙ্ক কষার ভঙ্গী। যে অ্যালজেব্রা জানে তার কাছে শুভঙ্করীর মূল্য কতটুকু?

প্রশ্ন ॥ হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের দু'শো বছর পূর্তি উপলক্ষে নানা জায়গায় তো খুব হৈ চৈ হচ্ছে, কিন্তু হ্যালহেড থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এই দুশো বছরের বাংলা ব্যাকরণচর্চায় বাংলা ভাষার প্রকৃতি কতটা ধরা পড়েছে?

সুকুমার সেন ॥ ছাখো, ভাষার সূচনা থেকেই তার ব্যাকরণও তৈরি হয়ে উঠেছে। তবে নিজের মাতৃভাষার ব্যাকরণ শেখার দরকার হয় না বলে আগেকার দিনের কোন বাঙালী বাংলা ব্যাকরণ লেখেন নি। ইউরোপীয় মিশনারীরাই সর্বপ্রথম নিজেদের প্রয়োজনে বাংলা ব্যাকরণ লিখতে শুরু করেন। তারপর একে একে আরো অনেকে লিখতে থাকেন। এই সব ব্যাকরণ প্রধানতঃ দুটো স্টাইলে লেখা—ইংরেজি আর সংস্কৃত। এছাড়া mixed style-ও আছে। তবে সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ভাষার essentials-এর কোন ব্যাকরণ এখনো লেখা হয় নি।

প্রশ্ন ॥ অনেকে বলেন খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ আজও লেখা হয় নি, এ কথা কি ঠিক?

সুকুমার সেন ॥ খাঁটি বাংলা কাকে বলবে? যদি খাঁটি বাংলা বলতে তদ্ভব বাংলাকে বোঝাও, তবে বাংলায় ক্রিয়াপদ বাদ দিলে শতকরা ২৫ ভাগ তদ্ভব শব্দও ব্যবহার করি কিনা সন্দেহ। কাজেই তদ্ভব বাংলার ব্যাকরণ হবে কী করে? তবে ঐ যা বললুম—বাংলা ভাষার essentials এর কোন ব্যাকরণ সত্যিই আজ পর্যন্ত লেখা হয় নি।

প্রশ্ন ॥ আপনি লিখছেন না কেন?

সুকুমার সেন ॥ আমি লিখেছি একটা ছোট করে। আমার 'ভাষার ইতিবৃত্তে'র নতুন সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। ওর পরিশিষ্টে চলিত বাংলার ব্যাকরণ জুড়ে দেব।

প্রশ্ন ॥ বাংলার বিদ্বৎসমাজে আপনি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবেই পরিচিত নন। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক হিসেবেও আপনার স্থান সুরক্ষিত। আপনার এই সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রেরণা কী?

সুকুমার সেন ॥ আমার সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রেরণা বলতে তেমন কিছু নেই। বর্ধমানে আমাদের দেশের বাড়িতে বাবার বড় লাইব্রেরী ছিল, তাতে নানা বিষয়ের প্রচুর বই ছিল। ছোটদের বই পড়ার ব্যাপারে অনেক পরিবারের অভিভাবকেরা ছোটদের ওপর অনেক রকম বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকেন, কিন্তু আমার বাবা তা করতেন না। ফলে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বাংলায় ভদ্র এবং বটতলার বই যত ছাপা হয়েছিল তার খুব কমই আমার অপঠিত ছিল। এই এত বই পড়ার ফলে ছোটবেলা থেকেই আমার মনের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট বোধ দানা বেঁধে উঠেছিল। পরে বড় হয়ে সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রেরণা পাই একটি ঘটনায়।

সেটা ১৯২৭-২৮ সালের কথা। সুনীতিবাবু তখন থাকতেন সুকিয়া স্ট্রীটে। আমি প্রায় প্রতি সকালেই তাঁর কাছে যেতুম। একদিন গিয়ে দেখি একজন দীর্ঘকায় সুদর্শন বয়স্ক লোক সুনীতিবাবুকে একখানা বই উপহার দিলেন। বইটি সিল্কের কাপড়ে মোড়া। মলাটের ওপর নাগরী হরফে বইয়ের নাম লেখা। ভদ্রলোক চলে যাবার পর সুনীতিবাবু বললেন, ইনি নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। দ্বারভাঙার মহারাজার অর্থানুকূল্যে গোবিন্দদাস ঝার পদাবলী ছাপিয়ে উপহার দিতে এসেছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর মতে ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস বাঙালী নন, মৈথিল, তাঁর পদ মিথিলায় পাওয়া গিয়েছে। সুনীতিবাবুর কাছ থেকে বইখানি নিয়ে উলটে পালটে দেখলুম, মনে হল এর সব পদই 'পদকল্পতরু'তে আছে, তবে ক্রিয়া আর কোন কোন সর্বনাম পদ মৈথিলীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সুনীতিবাবুকে বললুম নগেন্দ্রবাবুর মত কিছুতেই স্বীকার করা যায় না, ইনি বাঙালী ছাড়া আর কিছু নন। সুনীতিবাবু বললেন, তাহলে নগেন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ করে একটা প্রবন্ধ লিখুন না। তাঁর কথামতো বিরাট একটা প্রবন্ধ লিখলুম। প্রবন্ধটি 'গোবিন্দদাস কবিরাজ' নামে ১৩৩১ সালের সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় ছাপা হল। নগেন্দ্রবাবু আমার প্রবন্ধের আর কোন প্রত্যুত্তর দেন নি। এখান থেকেই আমার বৈষ্ণব সাহিত্য—শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য কেন সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যেরই আলোচনার সূচনা হলো বলতে পারো। এর পর আর একদিন সুনীতিবাবুর বাড়িতে আলাপ হ'লো সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে। তিনি তখন সবেমাত্র 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন। তিনি আমাকে

বাংলা গদ্য সম্পর্কে তাঁর পত্রিকায় লিখতে বললেন। সেই লেখা হলো ‘বাংলা সাহিত্যে গদ্য’।

এই সময় সুনীতিবাবু একবার বিলেত গেলেন। তিনি বাংলার এম এ-ক্লাসে যে বিষয় পড়াতেন, যাবার সময় তিনি সেই বিষয় পড়াবার ভার আমাকে দিয়ে গেলেন। এম. এ ক্লাসে বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। প্রথম দিন ছেলেরা অবশ্য খুব ভাল ভাবে আমার সংবর্ধনা করে নি। কেউ বা বসে রইল, কেউ বা আদ্ধেক উঠল। কেউ বসে বসেই কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গী করল। আমি প্রত্যেককে উঠে দাঁড়াতে আদেশ করে বললুম, এই দাঁড়ানোতে আমার সম্মান যতটা, আপনাদেরও সম্মান ততটা। তারা আমার আদেশ মান্য করল এবং ক্রমে ক্রমে আমাকে স্বীকার করে নিল। এই বাংলা ক্লাসেরই এক ছাত্রের অভিভাবকের বইয়ের ব্যবসা ছিল। সেই ছাত্রটিই পাশ করবার পর একদিন সাহিত্যের ইতিহাস ছাপাবার প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এল। আমি রাজি হলুম। বই বেরুল।

প্রশ্ন॥ আপনার মতে সাহিত্যের ইতিহাসের যথার্থ আদর্শ কী হওয়া উচিত?

সুকুমার সেন॥ আদর্শ বলতে কী বলব? এক কথায় বলতে পারো, সত্যের প্রকাশ। যা সত্যি তাকে তথ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতার আদর্শ হওয়া উচিত। এর জন্য কোন মতের গোঁড়ামি থাকা উচিত নয়। নিশ্চয়ই দেখেছ, আমার সাহিত্যের ইতিহাসে যেখানেই দরকার হয়েছে সেখানেই আমি আমার আগেকার মত revise করেছি।

প্রশ্ন॥ একালে যেসব সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে তাতে এই আদর্শ কতটা অনুসৃত হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

সুকুমার সেন॥ আমার পরে যাঁরা একাজ করেছেন তারা প্রায় সকলেই আমার উচ্ছিষ্টভোজী। নতুন কোন তথ্য সংগ্রহের কষ্টটুকু না করে আমি যা জোগাড় করেছি তাকেই সম্বল করে বই লিখেছেন। এ ছাড়া, এঁদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীই আবার নিরপেক্ষ নয়। কাউকে ছোট, কাউকে বড় করতে হবে— এমন একটা আগে থেকে তৈরি করা দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা সাহিত্যের ইতিহাস লিখছেন।

প্রশ্ন॥ আপনার সাহিত্যের ইতিহাসের তো চারটি খণ্ড। আর কোন নতুন খণ্ড লেখার পরিকল্পনা আছে কি?

সুকুমার সেন॥ না, নতুন কোন খণ্ড লেখার পরিকল্পনা নেই। একে চোখের অসুখ, তার ওপর অন্য কাজের চাপ তো আছেই। তাছাড়া, আমি মনে করি, ইতিহাস লিখতে গেলে লেখক আর লেখার বিষয়ের মধ্যে একটু সময়ের দূরত্ব থাকা দরকার। চোখের খুব কাছে আনলে কি কোন জিনিস দেখা যায়? দেখতে হলে জিনিসটাকে চোখ থেকে একটু দূরেই রাখতে হয়। এইজন্যই আমি সমসাময়িক কালের সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে চাই না।

প্রশ্ন॥ তবু সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে আপনার একটা মতামত তো আছে? সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

সুকুমার সেন॥ তার একটা অসুবিধা আছে। আমি তো মিষ্টভাষী নই। যা সত্যি মনে করি তা-ই মুখের ওপর বলে দিই। ফলে অনেকে বেজার হবেন। একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে আমার ছাত্র বা ছাত্রস্থানীয় অনেকে আছেন। তারাও অনেকে খুশি হবেন না স্পষ্ট কথা বললে। তবে সমসাময়িকদের মধ্যে তারাশংকর, সতীনাথ ভাদুড়ী বা সৈয়দ মুজতবা সম্পর্কে তাদের মৃত্যুর পর লিখেছি।

প্রশ্ন॥ আচ্ছা, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এ সাহিত্য অবক্ষয়ী না সমৃদ্ধিমান?

সুকুমার সেন॥ ভ্যাখো, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এমন একটা স্তরে তুলে দিয়েছেন যে তাঁর পরে বাংলায় খারাপ লেখা খুবই কঠিন। তবে পাহাড়ে যেমন এক একটা বড়ো peak-এর পরেই নীচু নীচু অনেক উপত্যকা, সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনি বড়ো বড়ো প্রতিভার পরেই নীচু নীচু অনেক প্রতিভা। এঁরা নিজেরা খুব বড়ো নন, তবে এঁরা সাহিত্যের প্রবাহ বজায় রেখেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ক'টা বড়ো peak আছে? সেই কালিদাস একটা বড়ো peak, তারপর জয়দেব একটা বড়ো peak। জয়দেবকে বড়ো বলছি কেন, তিনি সংস্কৃতের সঙ্গে vernacular-এর মিলন ঘটিয়েছিলেন। তারপর বড়ো peak রবীন্দ্রনাথ। মাঝে সব নীচু নীচু উপত্যকা। রবীন্দ্রনাথের পর আমাদের এখনকার সাহিত্যের দশা এই নীচু উপত্যকার মত। সাহিত্যের

এই নীচু দশা হবার একটা কারণ—পয়সা। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যচর্চায় পয়সা ছিল না, এখন সাহিত্যচর্চায় পয়সা মেলে। যেমন তেমন লিখলেই পয়সা পাওয়া যায় বলে এখন লেখার মান গেছে নেমে।

প্রশ্ন॥ আপনি কী ধরণের বই পড়তে ভালবাসেন?

সুকুমার সেন॥ সাধারণভাবে গবেষণার উপযোগী বইপত্রই পড়ি। তবে recreation-এর জন্য পড়ি বিলাতী ডিটেকটিভ নভেল ও গল্প। এছাড়া, ১৯৪৮ সাল থেকে আমি আমেরিকার Mystery Magazine-এর নিয়মিত গ্রাহক।

প্রশ্ন॥ ডিটেকটিভ কাহিনীর প্রতি আপনার এই পক্ষপাতের কোন বিশেষ কারণ আছে কি?

সুকুমার সেন॥ দ্যাখো, আগের তুলনায় ডিটেকটিভ গল্পের অনেক উন্নতি হয়েছে। অন্য নভেল কেবল বাহাদুরি, সেখানকার Sex-এর বাড়াবাড়ির চেয়ে ডিটেকটিভ নভেলের বুদ্ধির খেলা অনেক বেশী ভাল। Detective novel is the novel of the future।

প্রশ্ন॥ বাংলা ডিটেকটিভ নভেল পড়েন না?

সুকুমার সেন॥ আগেকার আমলের সব বাংলা ডিটেকটিভ বই—শরৎচন্দ্র সরকার, পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, বিনোদবিহারী শীল—এঁদের সকলের লেখাই তো গুলে খেয়েছি। কিন্তু এখন আর বাংলায় তেমন বিলিতী মানের ডিটেকটিভ গল্প কৈ? শরদিন্দুবাবুর দু'তিনটি গল্প অবশ্য ভাল লাগে, বাকীগুলি তো সবই বিলিতী গল্পের দ্বারা প্রভাবিত।

প্রশ্ন॥ শুনেছি, আপনি শুধু রহস্য গল্প পড়েনই না, নিজে লিখেও থাকেন। আপনার প্রকাশিত গল্পের বইগুলোর একটু পরিচয় দেবেন কি?

সুকুমার সেন॥ গত তিন বছরে আমার তিনখানি গল্পের বই বেরিয়েছে—ছিয়াত্তরে 'কালিদাস তাঁর কালে', সাতাত্তরে 'যিনি সকল কাজের কাজী', আর এই আটাত্তরে বেরিয়েছে 'সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ'।

প্রশ্ন॥ আপনার প্রথম গল্প কি?

সুকুমার সেন॥ প্রথম গল্প 'কন্যাদায়'।

প্রশ্ন॥ গল্প ছাড়া সৃষ্টিধর্মী আর কী লিখেছেন?

সুকুমার সেন ॥ কিছু সংস্কৃত কূট শ্লোক লিখেছি। এগুলোও রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ॥ এখন কী নিয়ে লিখছেন ?

সুকুমার সেন ॥ এখন লিখছি Comparative mythology নিয়ে। আগে লিখেছি রামায়ণ নিয়ে—সে সব তোমরা পড়েছ। এবার লিখছি মহাভারত নিয়ে। কী লিখছি তা বলব না, তবে লিখছি something revolutionary—ইউরোপে যেমন হয়েছে mythology নিয়ে। এছাড়া, বেদের আমল থেকে নানা মাতৃদেবীর আরাধনা নিয়ে ইংরেজিতে গবেষণানিবন্ধ The Great Goddes in Indian Lore লিখে শেষ করেছি।

প্রশ্ন ॥ কোন পত্রিকায় প্রকাশ করছেন সেটা ?

সুকুমার সেন ॥ পত্রিকায় ছাপাব না, একেবারে monograph বার করব। এটা ছাড়া Place names of Bengal নিয়েও লিখছি। Bengal বলতে অবশ্য Burdwan Division-এর নানা জায়গাকে নিয়েই লিখছি। পরে অবশ্য এই আলোচনার সূত্র ধরে অন্য জায়গার নামের আলোচনাও চলতে পারবে।

প্রশ্ন ॥ আপনি তো সারা জীবন ধরে অনেক লিখেছেন। এই সব লেখার মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় লেখা কোন্‌টি ?

সুকুমার সেন ॥ (একটু থেমে চিন্তা করতে করতে) তা যদি বল, তবে আমার নিজের লেখা সবচেয়ে ভাল বই হচ্ছে ঐ তিনখানা গল্পের বই আর সাহিত্যের ইতিহাসের রবীন্দ্রনাথ volume। আমি তো নিজের লেখা ঘুরে ফিরে বিশেষ পড়ি না। কিন্তু ঐ বইগুলো বার বার পড়তে ইচ্ছে করে।

প্রশ্ন ॥ আচ্ছা, এবার একটা ভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করি। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃতকে ও স্নাতক স্তরে বাংলাকে ঐচ্ছিক করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একজন ভাষাবিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌ হিসাবে এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ?

সুকুমার সেন ॥ সংস্কৃত আজকাল যেভাবে শেখানো হয় তাতে তা রাখার চেয়ে তুলে দেওয়াই ভাল। আগে আমাদের ছেলেবেলায় আমরা সংস্কৃত শিখেছি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। তাতে ভাষাশিক্ষারও ভিতটা শক্ত হত, মনের উর্বরতাও বৃদ্ধি পেত। সংস্কৃতশিক্ষার কাজ তখন ছিল মনের মাটিতে লাঙল

চষা, আর এখন যা করা হচ্ছে তা হলো মনের মাটিতে ডুবুমুশ করা। এর ফল ভাল হচ্ছে না। এখন সকলেরই নজর কী করে এম. এ পাশ করে একটা চাকরি বাগানো যায়। সংস্কৃত শেখার প্রকৃত আগ্রহ ক'জনের আছে? সংস্কৃতশিক্ষার এই ব্যবসাদারির চেয়ে পাঠ্যতালিকা থেকে সংস্কৃত তুলে দেওয়াই ভাল। আর বাংলার কথা বলছ? বাংলার সিলেবাসেই বা ভালো করে বাংলা শেখাবার ব্যবস্থা কোথায়?

প্রশ্ন ॥ অনেক ধন্যবাদ, আপনার জীবনের নানা কথা জানবার সুযোগ দিলেন বলে। আচ্ছা, নিজের জীবনের নানা স্মৃতি নিয়ে একটা আত্মজীবনী লিখুন না।

সুকুমার সেন ॥ লিখে কী হবে? কে পড়বে? কার কাজে লাগবে আমার আত্মজীবনী?

প্রশ্ন ॥ অনেকেরই কাজে লাগবে আপনার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা।

সুকুমার সেন ॥ না হে, কারো কোন কাজে লাগবে না। কেউ কিছু জানতেই চায় না। রিটায়ার করার পর ভাবলুম, এবার পথের ধারের জলের tap-এর মতো বসে থাকব, যার দরকার হবে এসে জ্ঞানের ঘট ভরে নিয়ে যাবে—I shall be tapped। কিন্তু কেউ আসে না। বড়ো disappointed হয়েছি। যারা আসে তাঁরা কেউ চায় certificate, কেউ চায় চাকরির সুপারিশ। জানতে কেউ চায় না। অবশ্য কিছু বিদেশী ছেলেমেয়ে আসে জানার আগ্রহ নিয়ে। এটা খুব ভাল লাগে।

প্রশ্ন ॥ তবু উত্তরপুরুষকে আপনার জীবনের কথা জানার সুযোগ দেবেন না?

সুকুমার সেন ॥ লিখছি, আত্মকথার ধরনে একটা লেখা লিখছি।

প্রশ্ন ॥ কোথয়ে ছাপছেন?

সুকুমার সেন ॥ ছাপাব কি না ঠিক করি নি। লিখছি, সারা জীবন ধরে কিছু মানুষকে দেখেছি যাঁরা সাধারণ হয়েও অসাধারণ। এঁদের কথা লিখে রাখলে এঁরা অনেকদিন মানুষের মনে বেঁচে থাকতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে লেখা। এতে আমার নিজের কথা খুব কমই আছে। আমি আছি সূত্রধার হিসেবে—নিজের কথা যেটুকু না বললে নয় সেটুকু মাত্র বলেছি।

প্রশ্ন ॥ বাল্যজীবন থেকে শুরু করেছেন তো?

সুকুমার সেন ॥ হ্যাঁ, বাল্যজীবন থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত লেখা হয়েছে। বাল্যকাল আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জন্মেছি কলকাতায় মামার বাড়িতে, কিন্তু ৬ মাস বয়সে গ্রামের বাড়িতে যাই। তারপর থেকে বাল্যজীবন কেটেছে গোতানের গ্রামের বাড়িতে। বাল্যজীবন দেশের ঐ রকম প্রশস্ত আবহাওয়ায় না কাটালে মনটাও প্রশস্ত হত না। কাজেই আমার মনের উপর আমার দেশের প্রভাব আছে বলে মনে করি। দেশের বাড়ির সেই ছেলেবেলার কথা খুব মনে পড়ে। সেখানে থাকতেন ঠাকুর্দা আর বাবার জেঠাইমা। ইনি আমায় খুব ভালবাসতেন। এঁদের ছেড়ে আমি কলকাতায় মামার বাড়ি যেতেই চাইতুম না। কারণ দেশের তুলনায় কলকাতাকে বড় সংকীর্ণ মনে হত। তবু কলকাতাতেই আমার জন্ম, কলকাতাতেই আমার পুনর্জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে একবার কলকাতায় এসেছিলুম। বাবা তখন কী কাজে কটকে গিয়েছেন। আমি এদিকে গুরুতর অসুখে পড়েছি। মেডিক্যাল কলেজের বড় সাহেব ডাক্তারও অসুখ ধরতে পারলেন না। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবা চলে এলেন। তিন সপ্তাহ ধরে আমার বাক্-রোধ হয়ে গিয়েছিল, মাথার শক্ত খুলি নরম তলতলে। বাঁচার কোন আশাই নেই। শেষে বাবার পরিচিত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় রোগ নির্ণয় করলেন। তাঁর diagnosis অনুসারে ডাঃ সুদেশ ভট্টাচার্য ও ডাঃ য়ুনানের চিকিৎসায় আমি ভাল হয়ে উঠলুম। সেই আমার পুনর্জন্ম। তাই আমি বলি আমি কলকাতায় দ্বিজ। লোকে আমার পদবী দেখে আমায় বৈদ্যবংশীয় বলে ভুল করেন, আমি কিন্তু বলি আমি বংশে কায়স্থ হলেও আসলে কলকাতায় twice-born। কলকাততেই আমার দুই জন্ম, তারপর কর্ম, বিবাহ, অবসর সব কিছুই এই কলকাতা শহরে।

সংযোজন ১ ডঃ সুকুমার সেনের জীবনপঞ্জী

জন্ম: ১৯০১, কলকাতায় মাতুলালয়ে। পিতা হরেন্দ্রনাথ, মাতা নবনলিনী দেবী।

শিক্ষা: বিদ্যারম্ভ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। ম্যাট্রিক (১৯১৭—প্রথম বিভাগ)। আই. এ বর্ধমান রাজ কলেজ ১৯১৯ (প্রথম বিভাগ—বাংলা, সংস্কৃত

ও অঙ্কে লেটার)। বি এ সংস্কৃতে অনার্সসহ, কলকাতা সংস্কৃত কলেজ, ১৯২১ (প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়)। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম এ. ১৯২৩, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম—প্রসন্নকুমারী স্বর্ণপদক প্রাপ্তি। P R S—১৯২৪। Ph D—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬। তিনবার গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার ও দুবার আশুতোষ স্বর্ণপদক প্রাপ্তি- এই সব সম্মানের উপলক্ষ অশ্বঘোষ ও কালিদাস, ব্রজবলি সাহিত্য, ব্রজবুলি ভাষা, বাংলায় নারীর ভাষা, বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষার রূপাবলী বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা।

কর্মজীবন ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব-বিভাগে অধ্যাপক রূপে যোগ দান। ১৯৫০ সালে ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ। ১৯৬৪ সালে ঐ বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ। অধ্যাপনা কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিভাগ ছাড়াও বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ও ঐস্লামিক সংস্কৃতি বিভাগেও অধ্যাপনা। ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত পুনার ডেকান কলেজ আমন্ত্রিত অধ্যাপক।

ডঃ সেনের অধীনে প্রায় ৭০ জন গবেষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী, রাঁচী, পাটনা, বিহার, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-নির্দেশক। তাঁর অধীনে যেসব বিদেশী ছাত্র গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে এডওয়ার্ড ডিমক, ওয়াই নারা, টি. নারা, পি. গাফকে, জোসেফ ও কর্নেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্মানপ্রাপ্তি সরোজিনী পদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) যদুনাথ সরকার পদক (এশিয়াটিক সোসাইটি), রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য (টেগোর রিসার্চ সোসাইটি) ডি লিট (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), সভাপতি (লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি ২ বার), সভাপতি (বাংলা পরিভাষা সংসদ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার) সভাপতি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), ফেলো (সাহিত্য অকাদেমি)।

শখ ও আগ্রহ: ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও পুরাতত্ত্বে গভীর আগ্রহ, আসলে তাঁর ক্ষেত্রে এ দুটি একে অপরের পরিপূরক। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও বর্ধমান সাহিত্যসভার প্রায় বারো হাজার বাংলা ও সংস্কৃত পুথি পরীক্ষা করেছেন। জয়দেবের প্রাচীনতম পুথিটি তাঁরই আবিষ্কার। পুথি ছাড়াও মূর্তি, পট, মুদ্রা,

পুথির পাটাচিত্র তাঁর সংগ্রহে আছে। এ ছাড়াও আছে প্রাচীন পাঁচালী গান, বটতলার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও রবীন্দ্র সংগীতের অধুনালুপ্ত প্রচুর রেকর্ড।

ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাষী, সহজ, অকপট ও কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। স্মিতিধর। অতিথিবৎসল।

সংযোজন ২ গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গবেষণাগ্রন্থ :

বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৯৩৭), বাংলা সাহিত্যের কথা (১৯৩৯), ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৩৯), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪০-৫৮, ৪ খণ্ড), প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী (১৩৫০), মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (১৩৫২), বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী ও গীতত্রিংশতিকা (১৩৫৪), ইসলামী বাংলা সাহিত্য (১৩৫৮) ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬১), রবীন্দ্ররচনা ভূমিদেশিকা (১৯৬৭), পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ (১৯৬২), বাংলার সাহিত্য ইতিহাস (১৩৭২), নট নাট্য ও নাটক (১৩৭২) বঙ্গভূমিকা (১৩৮১), রাম কথার প্রাক্-ইতিহাস (১৯৭৭)।

প্রবন্ধ সংকলন :

বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড (১৯৫৫), বিচিত্র সাহিত্য ২য় খণ্ড (১৯৫৬) বিচিত্র নিবন্ধ (১৯৬১), বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ (১৯৭০)।

গল্পগ্রন্থ

কালিদাস তার কালে (১৯৭৬), যিনি সকল কাজের কাজী (১৯৭৭), সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ (১৯৭৮)।

সম্পাদিত গ্রন্থ :

রূপরামের ধর্মমঙ্গল (১৯৪৪), কীর্তিবিলাস (১৩৬২) রূপরামের ধর্মমঙ্গল অতিরিক্ত পালাসহ (১৩৬৬) চর্যাগীতি পদাবলী (২য় সং ১৯৫৬), বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৫৭), চৈতন্যচরিতামৃত (১৯৬৩) মেঘদূত (১৯৭৫) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল (১৯৭৫) চৈতন্য ভাগবত (যন্ত্রস্থ)।

ইংরেজী গ্রন্থ

Outlines of Syntax in Buddhistic Sanskrit (1927), Women's dialect in Indo Aryan (1928), The Use of Cases in Vedic Prose (1929) A History of Brajabuli Literature (1935). Old Persian Inscriptions (1942). History of Bengali Literature (1960), Prakrita and Vernacular Verses in Dharmadasa's Vidagdhamukhamandana (1950), Historical Syntax of Middle Indo-Aryan (1953), History and Pre-history of Sanskrit (1958) Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan (1960), An Etymological Dictionary of Bengali (1971), Origin and Development of Rama Legend (1977), William Carey's Itihasamala translated into English with introduction and notes (1977), Women's Dialect in Bengali (in Press) Suniti Kumar Chatterji in the *Makers of India* Series (in press)

সম্পাদিত গ্রন্থ :

Sekasubhodaya with Notes in English and the Bengali Text in Bengali Script (1927) Manasa-Vijaya of Vipradasa Pipilai (1953)

MIA Reader (1957), Gaurangavijaya of Cudamanidasa (1957), Sekasubhodaya with the text in Nagari Script (1963), Manasamangal of Vishnupala (1971)

চর্যাগীতি-রসধারা

বারিদবরণ ঘোষ

অকর্ষিত ভূমিতে হলচালনা কষ্টসাধ্য জেনেও আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছি। আবিষ্কারের পথ থেকে অদ্যাবধি চর্যাগীতির বহুশাখায়িত আলোচনা পণ্ডিতসমাজ করেছেন। কিন্তু এর সঙ্গীত-বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে কিছু ভাবনা-চিন্তার সুযোগ আছে, সে সম্পর্কে উৎসাহ বড় একটা দেখা যায় না। অনেকে অবশ্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন চর্যাগীতির ভাষা-মূল্য সাহিত্য মূল্য ও ধর্ম-মূল্য নিরূপণের প্রসঙ্গক্রমে মাত্র।

চর্যাগীতির রাগ রাগিণী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়েছে ভাষাগত কারণে এর বাঙালিয়ানা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও অন্তর সম্পদে এ যে একেবারে বাঙালীর নিজস্ব জিনিষ সে কথা আরও একবার স্মরণ করার সুযোগ আছে। তাছাড়া চর্যাপদে সঙ্গীত-বৈশিষ্ট্য যে পরবর্তীকালে কিছু পরিমাণে প্রবাহিত হয়ে বাঙলার লোকসঙ্গীতে এসে মিশে গেছে সেকথা ভেবে চর্যাগীতির গীতিকারদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ আছে। চর্যাগীতির সাধন-বৈশিষ্ট্য কালের গর্ভে বিস্মৃত হয়ে গেছে, তার সঙ্গীতের ধারাও প্রায় লুপ্ত। সহস্র বৎসরের ব্যবধানের পর এদের সঙ্গীত-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রায় অসম্ভব একটা বিষয়। তবুও পুঁথির উল্লেখগুলি অবশ্য গ্রহণীয়। ফলিত রাগরাগিণী সম্পর্কে অজ্ঞতা এনবণের প্রবন্ধ রচনায় বাধা সৃষ্টি করছে। শশিভূষণ দাশগুপ্তের রচনা থেকে চর্যার সংগীত বৈশিষ্ট্যের একটা আন্দাজ মাত্র করা যায়।

২

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে তৃতীয় বারের জন্য নেপাল যান এবং নেপাল রাজ-দরবার-গ্রন্থশালা থেকে চারটি পুঁথি পেয়ে সেগুলিকে 'হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৯১৬ সালে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে চারটি

পুথির মধ্যে কেবলমাত্র চর্যার পুথিটিই বাঙলা ভাষায় রচিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই পুথির নাম চর্যা কেন হ'ল সেই বাদানুবাদে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। তবে একে 'চর্যাপদ' না বলে কেন 'চর্যাগীতি' বলছি প্রবন্ধের অন্যত্র তা আলোচনা করছি।

পুথিতে সর্বমোট আমরা সাড়ে ছেচল্লিশটি গানের সন্ধান পেয়েছি (মোট গান ৫১—একটি পুথি লেখক বাদ দিয়েছেন আর তিনটি গোটা গান ও একটি গানের প্রায় অর্দ্ধেক পুথির পাতা হারিয়ে যাওয়ায় আমাদের হস্তগত হয় নি)। গানের সূচনার হিসেব করলে অবশ্য ভগ্নাংশ না রেখে সাতচল্লিশটি গান ধরাই সঙ্গত। কারণ আমরা এই সাতচল্লিটি গানেরই রাগপরিচয় জানতে পেরেছি। প্রথমে আমরা চর্যাগীতি নিয়ে কোন্ কোন্ রাগে গাওয়া হত—তার একটা হিসেব দিচ্ছি। কতগুলি রাগে গাওয়া হত তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করছি না। কারণ কতকগুলি রাগের ভিন্ন নাম থাকলেও সেগুলি যে একই রাগের ভাষাতাত্ত্বিক নাম-বিবর্তন তাতে সন্দেহ করি না। রাগগুলি হ'ল :—পটমঞ্জরী, গবড়া বা গউড়া, অরু, গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, বরাড়ী / বড়ারী / বলাড্ডি, গুঞ্জরী, শবরী / শবরী, মল্লার / মল্লারী, মালশী / মালসী গবুড়া, কহ্নু গুঞ্জরী এবং বঙ্গাল।

সাতচল্লিশটি গানের মধ্যে পটমঞ্জরী রাগে রচিত গানের সংখ্যা সর্বাধিক—এগারোটি। এরপর মল্লার / মল্লারী রাগে পাঁচটি গান রচিত হয়েছে। ভৈরবী, কামোদ ও বরাড়ি রাগে রচিত গানের সংখ্যা চারটি করে। গবড়া / গউড়া—৩, দেশাখ রামক্রী গুঞ্জরী এবং শবরী—প্রত্যেকের দুটি ক'রে এবং অরু, গুর্জরী, ধনসী, দেবক্রী, মালশী, মালশী গবুড়া, কহ্নু গুঞ্জরী ও বঙ্গাল রাগে প্রত্যেকের একটি ক'রে গান।

যাঁরা সঙ্গীতচর্চা করে থাকেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, এই রাগগুলি মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের অন্তর্গত। মার্গসঙ্গীত কথাটি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করেছি। সঙ্গীতে জাত-পরিচয়ের জন্য রাগের প্রয়োজন আছে। তবে রাগের নামকরণে এক একটি দেশের নামের প্রভাবও কম নয়। যেমন মুলতানী, গুজরী, মালব ইত্যাদি। চর্যাগীতির মধ্যে আমরা এই দেশীয় রাগ-রূপ অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করতে পারবো।

শাস্ত্রমতে ছয় রাগের ছ'টি হিসেবে পত্নী। এই ভাবে ভৈরব, মেঘ, নটনারায়ণ, বসন্ত, পঞ্চম ও শ্রী—এই ছয় রাগের ছত্রিশ রাগিণী। সঙ্গীতবিদ্ ব্রহ্মার মতে এই রাগগুলি যথাক্রমে শরৎ, বর্ষা, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শীতকালে গেয়। বর্ষাতে আমরা ভৈরবী রাগ পেয়েছি, আর পেয়েছি ভৈরব রাগের বঙ্গালী, গুর্জরী রামকেলি নামে রাগিণীগুলিতে। মেঘরাগের মল্লারী, নটনারায়ণের কামোদী, বসন্তের দেবকিরী (দেবক্রী) ও বরাটী (বরাড়ি) এবং পঞ্চমের পটমঞ্জরী রাগ পেয়েছি। লক্ষণীয় যে অন্যান্য সঙ্গীতাচার্যেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

বেদসম্ভূত ভারতীয় সঙ্গীতের আর একটা দিক এর দেশী রূপ। মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে দেশী সঙ্গীতের প্রভেদ কোথায় সে প্রসঙ্গে আচার্য মতঙ্গ তাঁর 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে লিখেছেন

আলাপাদি নিবদ্ধো যঃ স চ মার্গঃ প্রকীর্তিত।
আলাপাদি বিহীনস্তু স চ দেশী প্রকীর্তিতঃ॥

—অর্থাৎ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দেশী রাগে শাস্ত্রীয় বন্ধন কম। 'রাগবিবোধ'এর শ্লোক থেকে তার স্পষ্ট প্রমা। আহরণ করা যায়

দেশে দেশে রুচ্যা যজ্জন হৃদ্রঞ্জন তু সা দেশী।
স তু লোকরুচি বিকলিত প্রায়োলক্ষ্যাত্র দেশী তৎ॥

আবার একথাও বোঝা যাচ্ছে যে দেশী সঙ্গীত ও মার্গ সঙ্গীতে তেমন কোনো বিরোধ নেই। বরং দেশী মার্গের একটি শাখা—এমন বলায় কোনো আপত্তির কারণ দেখি না। 'রাগবিবোধে'র টীকাকার কল্লিনাথ তো এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এতো বিস্তৃত ভূমিকার প্রয়োজন এই কারণে যে চর্যার রাগরাগিণীর অধিকাংশই এই দেশীয় রাগের অন্তর্ভুক্ত। 'গৌড় রাগে গেয'—এই নির্দেশ টীকাকার চর্যার অধিকাংশ গানের প্রতি দিয়েছেন। গবুড়া বা গউড়া—'গৌড' শব্দের উচ্চারণের হেরফের মাত্র। দেশাখকে দেশাখ্ বা দেশাগ যা-ই বলি না কেন, রাগটি একেবারে দেশীয়। দেশাগ রাগের রূপ-নির্মিতি এই প্রকার :

আস্ফোটনবিস্কৃত লোমহর্ষো
নিবদ্ধ সন্নাহ বিশাল বাহুঃ।

প্রাংশু প্রচণ্ড দ্যুতিরিন্দু গৌরো
দেশাগ রূপঃ কিল মল্লমূর্তি ॥

শবরী—পার্বত্য শব্দ-জাত। একেবারে লৌকিক শব্দ। এবং 'বঙ্গাল' রাগ যে আমাদেরই 'আ মরি বাংলা' রাগ একথা বলায় দ্বিধা কোথায়? এ হিসেবে দেখছি মোট ৪৭টি গানের মধ্যে ১০টি গানের রাগ-নির্দেশে দেশীয় ছাপ সুস্পষ্ট। আর এই দেশ যে বাংলা দেশ, তা' সুনীতিবাবুর বায়ে (ODBL) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। বিশেষতঃ বঙ্গাল রাগে গেয় গানটি (ভুসুকু-রচিত ৪৩-সংখ্যক গানটি)। অর্থাৎ চর্যাগীতির 'গৌড়ত্ব' বা 'বঙ্গাল'ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খণ্ডিত বাংলা নয়, গৌড় বাংলার পূর্ণ জীবন। একেবারে জোর গলায় না হলেও চর্যাগীতিকার লুইপাদ ও ভুসুকু যে বাংলা দেশে বাস করেছিলেন, একথা বলতে দ্বিধা নেই। মহামহোপাধ্যায শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থের পরিশিষ্টে (৪॥৶ পৃষ্ঠা) লক্ষ্য করি কোর্ডিয়ার সাহেব তাঁর তন্ত্রের তালিকায় লুইপাদকে বাংলা দেশের লোক হিসেবে গণ্য করেছেন। ভুসুকু তো নিজেই বলেছেন 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভৈলী'। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-ও বলেছেন—'ভুসুকু এই বঙ্গাল দেশেরই এক প্রাচীন কবি।' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৮, পৃঃ ৪৬)।

৩

পটমঞ্জরীতে গান লিখেছেন লুই (১, ২৯), ভুসুকু (৬), কাহ্ন (৭, ৯), কৃষ্ণাচার্য্য (১১ ৩৬), বীণা (১৭), কুক্কুরী (২০), আর্যদেব (৩১) এবং ঢেণ্ঢণ (৩৩), গবড়া রাগে—কুক্কুরী (২), বিরুব (৩), অরু—গুণ্ডরী (৪), গুর্জরীতে লিখেছেন চাটিল্ল (৫), দেবক্রী—কম্বলাম্বর (৮), দেশাখ রাগের গান দুটি লিখেছেন কাহ্ন (১০), এবং সরহ (৩২), ভৈরবী গান চতুষ্টয়ের রচয়িতা —কৃষ্ণ (১২), মহীধর (১৬), কৃষ্ণ (বজ্র) (১৯), সরহ (৩৮), কামোদ-এর চারটি গানের গীতিকার কৃষ্ণাচার্য্য (১০), ভুসুকু (২০), তাড়ক (৩৭), কাহ্ন (৪২), ধনসীতে ডোম্বী (১৪) গান রচনা করেছেন। রামক্রীতে গান দু'টি লিখেছেন শান্তি (১৫), শবর (৫০), গউড়ার গীতিকার কৃষ্ণবজ্র (স), বরাড়ীতে ভুসুকু (২১, ২৩) ও দারিক (৩৪) লিখেছেন। গুঞ্জরীর গীতিকার সরহ (২২), এবং ধাম (৪৭), শান্তি (২৬) ও জয়ানন্দী (৪৩) লিখেছেন

শবরী রাগে। মল্লারীতে তিনজন লিখেছেন। এর মধ্যে ভুসুকু দুটি পদ (৩০, ৭৯) ভাদে একটি (৩৫) এবং কাহ্নু একটি (৪৫), মালসী ও মালসী গবুড়াতে লিখেছেন যথাক্রমে সরহ (৩৯) এবং কাহ্নু (৪০), কহ্নুগুঞ্জরীর রচয়িতা ভুসুকু (৪১), ভুসুকু বঙ্গাল রাগেও লিখেছেন (৪৩), মল্লার বাগে লিখেছেন কঙ্কণ (৪৪) এবং বলাড্ডি রাগের গানটির রচয়িতা শবর।

৪

রাগের সঙ্গে গানের বিষয়বস্তুর কি সম্পর্ক আছে জানি না। তবে মাঝে মাঝে দেখা গেছে রাগের সঙ্গে ভাবের হরগৌরীমিলন ঘটে যায়। জয়দেবের গানে তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন রাধার প্রিয়বিচ্ছিন্ন মনোভাব পঞ্চম সর্গের অন্তর্গত (শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্) ববাড়ি রাগের 'বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়' গানে ফুটে উঠেছে। বরাডী রাগের লক্ষণ এই প্রকার

বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী
সুকঙ্কণা চামর চালনেন।
কর্ণে দধানা সুরপুষ্প গুচ্ছম্
বরাঙ্গনেযং কথিতা ববাড়ী॥

চর্যার গানগুলিতে এমন ভাবের উচিত রাগ নির্দেশিত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় নি। এর দুটো কারণ হ'তে পারে। এক, ভাবে-রাগের অদ্বৈতসিদ্ধি ঘটাতেই হবে এর কোনো বাধ্যকতা চর্যাগীতিকারগণ অনুভব করেন নি এবং দুই, চর্যাগীতিকারেরা হয়তো এই রাগগুলি নির্দেশ করেন নি। দ্বিতীয়প্রকার অনুমানের কারণ এই যে, চর্যার যে পুথিটি আমরা পেয়েছি, সেটি প্রথমতঃ একটি সংকলনের পুঁথি এবং দ্বিতীয়তঃ এটি একটি টীকার পুঁথি। হয়তো টীকাকার স্বয়ং এই রাগগুলি সংযুক্ত করেছেন। এই অনুমানের পিছনে একটা কারণ আছে। ১-সংখ্যক এবং ৪৭ সংখ্যক গানের শুরুতে কোনো রাগ-নির্দেশ ছিল না। টীকাকারই আমাদের গান দুটিকে কোন্ রাগিণীতে গাইতে হবে, তার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫

চর্যার গানগুলির পঙ্‌ক্তিসংখ্যা আলোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাধারণতঃ গানগুলি দশ পংক্তির। ছেচল্লিশটি গানের মধ্যে (তেইশ-সংখ্যক

গানটি অসম্পূর্ণ) চল্লিশটি গানই দশ পঙ্‌ক্তির। ঊর্ধ্বসংখ্যার চৌদ্দ পংক্তিতে (মধুসূদনের অনেক পূর্বেই বাংলা ভাষার চতুর্দ্দশপদী।) রচিত গান তিনটির রচয়িতা কাহ্নুপাদ (১০) এবং শবরপাদ (২৮,৫০)। বারো পংক্তির গান দুটির রচয়িতা ভুসুকুপাদ (২১) এবং সরহ (২২)। কেবলমাত্র আট পঙ্‌ক্তিতে রচিত গানটি (৪০ সংখ্যক) ভুসুকুপাদের। ইনি বাঙালী হয়েছিলেন এবং গানটির রাগ, পূর্বেই উল্লেখ করেছি—'বঙ্গাল'।

৬

বাঙালী জাতি গীতিপ্রবণ। আমরা প্রভাতীগানে জাগি এবং মাসীপিসির গানে ঘুমিয়ে পড়ি। এই গীতিপ্রবণতার বাঙ্ময় রূপটি প্রথমে লিপি-আকারে ধরা পড়েছে চর্যাগীতিগুলিতে। এর অন্তরঙ্গে তত্ত্বকথার বিচিত্র ব্যাখ্যান। কালের গর্ভে সেই তত্ত্ব গেছে হারিয়ে। কিন্তু তত্ত্বকে ছাড়িয়ে এর একটা সাঙ্গীতিক আবেদনও আছে। চর্যাগানগুলি ঠিক কিভাবে গাওয়া হত জানি না। বেশ কিছুদিন আগে শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় লণ্ডনে গিয়ে 'স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ'-এর আর্নল্ড বাকের কাছ থেকে ১৯৫৫ সালে নেপাল থেকে রেকর্ড করা চ-চা (চর্যা'র অপভ্রংশ?) গান শোনেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায় টেপ রেকর্ডের সাহায্যে পুনশ্চ সেগুলি আমাদের শোনান। তা থেকে বোঝা যায় যে, গানগুলি উচ্চারণকালে হ্রস্ব অ ও দীর্ঘ-অ ও আ বিশেষ যত্ন সহকারে উচ্চারিত হয়। এগুলি মনোযোগের সঙ্গে বিচার করলে চর্যার শুদ্ধতর পাঠ-নির্ণয়ে সুবিধা হতে পারে। কাজেই তত্ত্ব ও সঙ্গীত একীভূত হয়ে গেছে এই চর্যাগানগুলিতে।

শিল্প-সংস্কৃতি উত্তরাধিকারের মধ্যে বেঁচে থাকে। চর্যা-গীতির রাগ-রাগিণী বা সঙ্গীত বৈশিষ্ট্য তার সাধনরহস্যের মত গুহায়িত হয়ে থাকে নি। তাই পরবর্তী বাংলা গ্রন্থগুলিতে এর ক্রমোৎসার ঘটেছে। সহজিয়া ধর্মে বাইরের অনেক ধর্মের মিশ্রণ থাকলেও এতে যেমন বাঙালির নিজত্বই প্রবল, তেমনি চর্যাগীতিতে রাগসঙ্গীতের প্রভাব থাকলেও লৌকিক সুরই এর প্রাণ। তাই তো চর্যার পরবর্তী কাব্য জয়দেবের শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চর্যার লৌকিক সুর নানাভাবে প্রবাহিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্পর্কে একটা ধারণা আছে যে, জয়দেব প্রথম এটিকে দেশীয় ভাষায় রচনা

করেন, পরবর্তীকালে এর সংস্কৃতরূপ প্রদত্ত হয়। এই মতের বিরোধিতা আমরা করি। কিন্তু চর্যাগীতি সম্পর্কে আমরা যদি এমন কথা বলি যে, চর্যাগীতিগুলির একটা নিজস্ব লৌকিক সুর ছিল, পরবর্তীকালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব পড়েছে, তাহলে বোধহয় ভুল করবো না। নাহলে টীকাকার মার্গ রাগগুলি সম্পর্কে 'গৌড় রাগে' গেয় কথাটি বার বার ব্যবহার করবেন কেন ? আর গৌড়-রাগ অর্থেই বাংলার লোক-ভিত্তিক গান মনে হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা ক্রমে গীতগোবিন্দে চর্যার উত্তরাধিকার সম্পর্কে দু চার কথা বলছি। গীতগোবিন্দে চর্যার নিম্নলিখিত রাগগুলির উল্লেখ রয়েছে—(১) মালব রাগ— 'প্রলয়পয়োধিজলে' দশাবতার শ্লোকটি এই রাগে গেয়, (২) গুর্জরী রাগ— সুপরিচিত 'রতিসুখসারে' গানটি এই রাগে নিবদ্ধ', (৩) রামকিরী (চর্যাগীতির রামক্রী)—'চন্দনে চর্চিত নীলকলেবর' গানের রাগ, (৪) দেশাগ (চর্যার দেশাখ)—এই রাগের গান—'বদসি যদি কিঞ্চিদপি', (৫) ভৈরবী—'রজনী জনিত গুরুজাগর' শীর্ষক গানটি এই রাগে রচিত এবং (৬) 'রাধাবদন বিলোকন' শীর্ষক গানটি বরাড়ী রাগে গেয়। লক্ষ্য করছি, একমাত্র মালব রাগ ছাড়া চর্যার আর সব রাগগুলিই গীতগোবিন্দে গীত হয়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে গীতগোবিন্দে 'দেশাগ' রাগের চারটি গান রয়েছে (৫ম, ৮ম, ১০ম ও ১১শ সর্গে)। চর্যাতে ছিল দুটি গান (১০, ৩২)।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে গীতগোবিন্দকার তাঁর গানগুলিকে 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' বলেছেন। অর্থাৎ গানগুলি হন 'পদ'। আমরা চর্যার গানগুলিকে 'পদ' বলি নি, বলেছি 'গীতি'। এবং এর কারণ নির্ণয় করছি। এগুলি সাধারণ ভাবে চর্যাপদ নামে পরিচিত হলেও শাস্ত্রী মহাশয় এগুলিকে বৌদ্ধ 'গান' বলেছিলেন। অবশ্য চর্যা 'পদ' শব্দটিরও স্রষ্টা কর্তা তিনিই। কিন্তু পদ আর গান সমার্থক নয়। গানের দুটি লাইনে একটি পদ। তাছাড়া সর্বত্রই চর্যাগীতি, দোহাগীতি, বজ্রগীতি, উপদেশগীতি ইত্যাদি ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও এদের সঙ্গে 'পদ' শব্দটি যুক্ত হয় নি। জয়দেবই 'পদ' শব্দটির বহুল প্রচার ঘটালেন।

যাই হোক্, জয়দেব দেশাগ রাগ বা বরাড়ী রাগের আগে 'দেশ' শব্দটি জুড়ে (দেশ বরাড়ী) দেশী গানের ঐতিহ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

৭

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকে জয়দেবের ভাবি ভাবশিষ্য বলা হয়ে থাকে। পালাগ্রন্থনায়, সংলাপ রচনায় ও গীতবচনে বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের অনুগামী। রাগ সন্নিবেশেও তিনি জয়দেবের তথা চর্যাগীতির অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বহু গান বরাড়ী, কহ্নুগুঞ্জরী (চর্যার কহ্নুগুঞ্জরী), ধানুষী (চর্যার ধানসী), গুজ্জরী, রামাগরী (চর্যার রামক্রী—'ক'-এর 'গ'-এ পরিবর্তন অন্ত্যমধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় বৈশিষ্ট্য), দেশাগ (চর্যার দেশাগ) ভৈরবী, মল্লার এবং বঙ্গাল প্রভৃতি রাগে রচিত হয়েছে। বরাড়ী রাগের সঙ্গে 'বঙ্গাল' শব্দটি সংযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেশীয় রূপটিকে আরও প্রকট ক'রে তুলেছে। এতদরিক্ত 'ভাটিয়ালী' রাগটিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্থান পেয়েছে। এই রাগটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে কিন্তু এই প্রবন্ধে তা অপ্রাসঙ্গিক। তবে একথা বলা অযথার্থ হবে না যে, চর্যার লৌকিক সুর প্রবণতার উত্তরাধিকারই জয়দেব এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘটেছে, বাংলা বৈষ্ণবপদাবলী, কীর্তন গান এবং লোকসংগীতে যার সার্থক রূপায়ন॥

বৈষ্ণবকাব্যের বাক্-প্রতিমা

বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বৈষ্ণব কবিতা বিষয়ক আলোচনায় সাধারণত কাব্যবিধৃত শব্দের অর্থ নির্ণয়ে, দার্শনিক তত্ত্ব নির্ণয়ে, টীকা ভাষ্য রচনায় সীমাবদ্ধ। এর যাথার্থ্য স্বীকার করে নিয়েও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হ'ল বৈষ্ণবপদকারেরা যদি কবি না হ'তেন, তাঁরা যদি কবিতা রচনা না করতেন তাহ'লে কি ঐ সব আলোচনার কোনো অবকাশ থাকত? এ কারণে আমাদের সাহিত্য সংবেদনায় মনে হয় তাঁরা মূলতঃ কবি, কবিতা রচনা করেছেন বলে অন্য সব চেষ্টা অর্থান্বিত হয়েছে। কবি বলেই তাঁরা স্মরণীয় এবং বরণীয়। অতএব তাঁদের কবিকর্মকে কবিতা হিসেবে দেখাটাই সঙ্গত, তাঁদের কারয়িত্রী প্রতিভার সম্যক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। বৈষ্ণব কবিরা 'ভক্ত কবি'—এমন কথা কাব্যের বিচারে খুব মূল্যবান নয়—তাঁদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার শিল্পিত রূপটা বড়ো কথা। লক্ষ্য করতে হবে কবিরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কিভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন, আমাদের অনুভূতিকে কোন্ পথে সঞ্চালিত করেছেন। এবং কতটাই বা উৎকর্ষ লাভ করেছে।

চিত্রশিল্পী ছবি আঁকেন ক্যানভাসের উপরে রঙ দিয়ে, তুলি দিয়ে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, সংবেদনার শিল্পরূপ করেন ছবিতে। সাহিত্যিক ছবি আঁকেন লেখনী দিয়ে, কাগজের বুকে কথাকে শৃঙ্খলিত করে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে তাঁরা কথায় ফুটিয়ে তোলেন। উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপায়ন ঘটে, আভাস দেয় ইন্দ্রিয়োত্তর জগতের। কেবল করণ-কৌশল ভিন্ন। কবি কথার মালা সাজিয়ে যে ছবি আঁকেন তাকে বলি 'বাক্-প্রতিমা'। শব্দ বাক্যবন্ধ, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদিকে আশ্রয় করে, পারস্পরিক প্রাণিক-সংযোগে সংযুক্ত হয়ে ওঠে বাক্ প্রতিমা—সঞ্চারিত হয়ে ওঠে বিশেষ আবেগ।

জীবনানন্দ দাশ নাটোরের বনলতা সেনের কথা লিখেছেন। আমরা বনলতা সেন নামে কোনো এক মহিলার চোখকে দেখতে পাই। এই চোখের আকার "পাখীর নীড়ের মতো।" শুধু তাই নয়, "নীড়" শব্দটির ব্যবহারের

ফলে পঙক্তিটির দ্যোতনা বেড়ে গেল অনেকখানি। 'নীড়ে' আছে শান্তি, নিরাপদ নিশ্চিন্ততা। সারা আকাশ বিহারের পর, ক্লান্তির পর, নীড়ে ফিরে লাভ করে পরমশান্তি। বনলতা সেনের চোখে কবি সেই "অতল অগাধ" শান্তি খুঁজে পান। এই চোখ উত্তেজিত করে না, কামনা মথিত করে না—শান্তির স্নিগ্ধ স্পর্শে সমাহিত করে। আবার লিখেছেন, "সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।" পঙক্তিটি "হাওয়ার রাত" কবিতা থেকে নেওয়া। এই পঙক্তিটির মধ্যে দৃশ্য, ধ্বনি, স্পর্শের সংবেদনা রয়েছে। ঝোড়ো হাওয়া সব কিছুকে প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। উৎক্ষিপ্ত বস্তুগুলোকে যেন চোখে দেখি, ঝড়ের বেগের স্পর্শ পাই, গর্জন করলে শুনি। সব মিলিয়ে ধ্বনিত হয়েছে গতির আবেগ, অজানা দিগন্তে উধাও হওয়ার আবেগ।

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি দুটির শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম উদ্ধৃতির 'চোখ তুলে' ক্রিয়াপদের তুলনায় দ্বিতীয় উদ্ধৃতির "হুঙ্কার,' "উৎক্ষিপ্ত" পদ দুটি অপেক্ষাকৃত জোরালো (energetic)। প্রথমটিতে আছে অনেক ক্লান্তির পর শান্তির ব্যঞ্জনা, পরেরটিতে সব বাঁধন ছিঁড়ে দিগন্তে উধাও হওয়ার দুরন্ত আবেগ। কবিতা দুটির প্রবহমান সুরে দেখি অনুরূপ প্রতিফলন। একটিতে বেজেছে অনেক পথ হাঁটার ক্লান্তির সুর, চলেছে ধীর গতিতে। অপরটিতে চাঞ্চল্যের আবেগ, চলেছে অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ে।

অতএব মূলতঃ লক্ষ্য করছি বাক্‌-প্রতিমার অনুধাবনের সূত্রে আমরা ব্যঞ্জনায় পৌঁছিয়েছি। শব্দ, বাক্যবন্ধ, ছন্দ, অলংকার সব মিলে যে প্রতিমাটি গড়ে উঠল তাতে অভিধানিক অর্থ ছাপিয়ে, আবেগসঞ্চারী গুণে আভাস পেল ব্যঞ্জনা। তখন আর কথায় আঁকা কোনো ছবি নয়—তার অতিরিক্ত কিছু ইঙ্গিত করছে। এর থেকে বাক্‌প্রতিমার গুরুত্ব কতটা তা সহজেই বুঝতে পারি। তাই আধুনিক সমালোচনায় বাক্‌-প্রতিমার বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে কবির অন্তরঙ্গ সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর কবি-বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়।

২

উপযুক্ত সামান্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বৈষ্ণব কবিতার বাক্‌-প্রতিমার বিচার করা যেতে পারে। বিদ্যাপতি লিখছেন

"তনু সঞে মিলি গেও সজল নীলাম্বর
বিন্দু বিন্দু ঝরু বারি।
রোয়ত সাটী মোহে ধনী তেজব
পহিরব আনহি সাড়ী॥"

পদটি পাঠ করবার সঙ্গে সঙ্গে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়? আমরা ভিজে নীলাম্বরী শাড়ি-পরা রাধিকাকে যেন দেখি—তাঁর দেহ লাবণ্য জড়িয়ে-থাকা ভিজে শাড়ির ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। তারপরেই "রোয়ত সাটী মোহে" শাড়ির কান্না যেন শ্রুতিগোচর হয়। শাড়ি নিশ্চেতন নয়। এর প্রাণ আছে, অনুভব করবার ক্ষমতা আছে, মমত্ব বোধ আছে। শাড়ি কাঁদে। রাধিকার সঙ্গ-সুখ বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় কাঁদে। "বিন্দু বিন্দু ঝরু বারি"—ভিজে শাড়ির জল নয়, চোখের জল রাধার সঙ্গ সুখে এতক্ষণ আনন্দ ছিল, এখন তার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বেদনাও। অতীত এবং বর্তমানের বিরোধ এখানে ব্যঞ্জনায় রূপ পেল। এবং শাড়ির উপরে নায়কের গুণ আরোপিত হওয়াতে শাড়ির কান্নার ভিতর দিয়ে কৃষ্ণের কান্না তির্যক্ত (refracted) হ'য়েছে। দৃশ্য এবং ধ্বনি সংবেদী বাক্-প্রতিমার আশ্রয়ে ব্যঞ্জিত হ'য়েছে কবিভাবনা। আরো লক্ষ্য করবার হ'ল, বিদ্যাপতি কৃষ্ণের দিক থেকে বিষয়টিকে অনুভব করছেন এবং পাঠককে সেইভাবে অনুভব করিয়েছেন

"শুনইতে রসকথা থাপয চিত।
জইসে কুরঙ্গিনী শুনযে সঙ্গীত॥

সবেমাত্র রাধিকা যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর মনের চঞ্চলতা এবং তাঁর অবস্থা বিশেষে আকস্মিক ক্ষান্তি, দৃশ্য এবং ধ্বনি সংবেদী বাক্প্রতিমায় উদ্ভাসিত হল। বনচারী চঞ্চলা হরিণী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দূরশ্রুত সঙ্গীত উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে। হরিণীর উৎকর্ণভঙ্গী, গতি-চাঞ্চল্যের আকস্মিক ক্ষান্তি চোখে যেন দেখতে পাই, আর গীতধ্বনি কানে যেন শুনতে পাই। রাধিকার রসকথা প্রসঙ্গে অনুরূপ অবস্থা হয়। নবোদ্গত যৌবনে রসকথা সঙ্গীত বলে মনে হয় নাকি? সঙ্গীতের মতো তার অমোঘ আকর্ষণ। উপমেয় এবং উপমানের নিটোল সাযুজ্যে গড়ে উঠেছে এই বাক্-প্রতিমা।

আবার রূপবর্ণনায় কবি লিখছেন—"মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু।"

কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চমকানি। মুহূর্তে আবির্ভূত—নিষ্ক্রান্তির সংকেতে সচকিত। নিমেষের মধ্যে চোখ ঝলসে দেয়। গৌরকান্তি রাধা নীলাম্বরী শাড়ি পরেই বেরিয়েছিলেন। নইলে মেঘ ও বিদ্যুতের উপমা এলো কেন? কৃষ্ণ নিমেষ মাত্র তাঁকে দেখেছেন। আর নিমেষেই রূপ হৃদয় কেটে বসেছে,—"হৃদয়ে শেল দেই গেল।" রূপতৃষ্ণার জ্বালার স্পর্শ যেন পাই। দর্শনেন্দ্রিয় এবং ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ আবেদন সৃষ্টি হ'য়েছে। প্রতিমাটি গড়ে উঠেছে ঐ দুই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপরে। কিন্তু আলাদা আলাদা খোপে বিভক্ত নয় এই অভিজ্ঞতা। এখানে যা দর্শনেন্দ্রিয়-সাধ্য তা উদ্বুদ্ধ করেছে ত্বক-ইন্দ্রিয়কে, এক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হ'ল আরেক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায়। মূলতঃ ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হ'ল রূপতৃষ্ণার আবেগ, রাধার সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা।

বিদ্যাপতির পদে এও লক্ষ্য করা যায় যে, যে সমস্ত প্রতিমা বহু ব্যবহারে জীর্ণ, যাকে বলে dead imagery, করণকৌশলের গুণে তা-ও হ'য়ে উঠেছে দ্যুতিময়। যেমন

"গিরিবর গরুঅ পয়োধর-পরশিত
গীম গজমোতিক হারা।
কাম কম্বুভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী ধারা॥"

গিরিবর তুল্য পয়োধর, শঙ্খের মতো গলা, গলার গজমোতির হার বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে, শ্রীরাধার সুঠাম দেহ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এর পরেই কবির আবেগ আরেকটি আধারে এসে প্রতিমার আভাস দেয় যেন। মনে হচ্ছে শিবের মাথায় সুরধুনীর ধারা বর্ষিত হ'চ্ছে। এক ভাবের অনুষঙ্গে জেগে উঠেছে আরেক ভাব। দেহের বর্ণনা নিছক রক্তমাংসের বন্ধনে আর আবদ্ধ রইল না—আভাস দিল দেহাতীতের। এখানেই কাব্য সুষমা। এই ক্রমবর্ণনা কামকে উদ্দীপিত করে না, শিব ও সুরধুনীর উল্লেখমাত্রেই সমগ্র পদটি নতুন দ্যোতনা লাভ করেছে, ইঙ্গিত করছে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের দিকে। এই মূর্তির মুখোমুখি হয়ে কাম "মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের" মতো মাথা নত করে। মাথা নত করে—শম্ভুর ধ্যানমূর্তির সম্মুখীন হয়ে। আর এখানকার "ঢারত" ক্রিয়াপদটি

সুরধুনীর ধারা পতনের ধ্বনিকে কর্ণগোচর করে। বাক্-প্রতিমায় রূপের মধ্যে আভাসিত হ'ল রূপাতীত। কবি যা বললেন তাকে চোখে দেখলাম, কানে শুনলাম, মনের রূপান্তর হ'ল।

বিদ্যাপতির মাথুরের পদ লক্ষ্য করা যাক :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘনগর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ শতশত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।

এই কবিতায় বিরহ বেদনার রাজসিক রূপ দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে রূপায়িত হয়েছে। ঘনঘোর বর্ষা, সূচীভেদ্য অন্ধকার, বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা নৃত্যশীল রূপ, ময়ূরের পেখম তুলে নাচ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে বজ্রপাতের শব্দ, দাদুরী, ডাহুকীর মিলনানন্দের কলরবের ধ্বনি সংবেদনা, আর রাধার মদনার্ত্ত প্রহারের যন্ত্রণা যেন সব মিলে বেদনার ঐশ্বর্যরূপকে ভাবমণ্ডিত করেছে। দুঃখ কত রাজসিক মূর্তি ধরতে পারে তার প্রমাণ এই কবিতাটি। এই কবিতার গোড়ায় আছে বেদনার ঐশ্বর্যরূপের ভাবনা, তাই সাবয়ব হ'য়েছে অমন বাক্-প্রতিমায়। এই কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে শোনাবার যোগ্য। ছন্দের মধ্যে গরগর ধ্বনি যেন নাভিকুণ্ড থেকে উৎসারিত। আরো লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল শব্দযোজনা। "ছাতিয়া" কথাটির আভিধানিক অর্থ হ'ল 'বুক', 'বুকের মাপ' (কথায় বলে

চল্লিশইঞ্চি বুকের ছাতি)। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে অন্য শব্দের সাহচর্যে কবিতার ভাবাবহে তার অর্থ দাঁড়ালো বেদনার ভারে হৃদয় ভেঙ্গে যাওয়া। শব্দের মধ্যে এইরকম গুণসঞ্চার মহৎ কবিতেই সম্ভব। দাত্যুহীর ডাক আদৌ স্ব-প্রকৃতিতে শ্রুতিমধুর নয়। কিন্তু এই কবিতার ভাবপ্রবাহে কী অসামান্য দ্যুতি লাভ করেছে। মূল কথাটা এই, কোনো শব্দ স্বভাবধর্মে কাব্যও নয়, অকাব্যও নয়। শব্দ অর্থকে প্রকাশ করে। শব্দ কাব্যত্ব লাভ করে প্রয়োগের গুণে, অন্য পাঁচটা শব্দের সাহচর্যে, বিশেষ ভাবপ্রবাহের উপযুক্ত অংশীদার হ'য়ে, ধ্বনি সৃষ্টির যোগ্যতায়। কবিতার কলাকৌশলের গুণে। কবিতা বিচারে ঐ বিশেষ কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

এবার জ্ঞানদাসের একটি কবিতা লক্ষ্য করা যাক। কবিতাটি নিরাভরণ, মণ্ডনকলায় সমৃদ্ধ নয়। কবি বক্তব্যের নিজস্ব শুদ্ধ শক্তির উপরে নির্ভর করেছেন, কেবল একটি আবেগ প্রকাশ করছেন। কবিতাটি বর্ণনাধর্মী। কবিতাটি এই,

"সখি সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক বাজ॥
আঙিনা আওল সেহ।
হাম চললু গেহ॥
ও ধক আঁচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেমকচোর॥
ধরিতে ধরল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোর চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥"

রাধিকা চলেছেন, পিছনে কৃষ্ণ একটু দাঁড়াবার জন্যে অনুনয়-বিনয় করছেন, শেষে আঁচল ধরে টান, রাধার খোঁপা এলিয়ে গেল, রাধা তো খোঁপা সামলাতে ব্যস্ত, এর ফাঁকে কৃষ্ণ হাত দিলের "হেমকঠোরে", তাতে অঙ্কিত হ'ল

নখর-রেখা। লুব্ধতার স্তর-বিন্যাসী চিত্র। কবি নিরলঙ্কার ঋজু ভাষায সব বর্ণনা করেছেন। কোনো দৃশ্যের ঐশ্বর্য নেই। সব মিলে গড়ে উঠেছে নিটোল বাক্‌-প্রতিমা। প্রস্ফুটিত হ'য়েছে কামনার আবেগ। বর্ণনার সরলতার মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়েছে মাধুর্যগুণ। "চললু, ধরু, ফুয়ল" ক্রিয়াপদের ব্যবহার মাধুর্যকে ধারণ করে আছে। আর এগুলো কেবল ব্যাকরণের সংজ্ঞা নয়—আবেগসঞ্চারী শব্দ। আবার 'তোড়ল" শব্দটি কৃষ্ণের কামনার জ্বালাকে এবং নখরাঘাত জনিত রাধার দৈহিক জ্বালাকে প্রকাশ করেছে। এই বৈপরীত্যের ভিতর দিযে ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা অভিব্যঞ্জিত হ'য়েছে। ইন্দ্রিয়চেতনার প্রখর জ্বালার ধার কমে গিয়েছে পূর্ব ব্যাখ্যাত 'চললু', 'ধরু', 'ফুয়ল' শব্দের ব্যবহার করে এবং শেষ দুইটি পঙ্‌ক্তিতে। শেষের দুই পঙক্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায ঐ নখরাঘাত কাঙ্ক্ষিত এবং সেইজন্য মধুরও বটে, নইলে কৃষ্ণের প্রসঙ্গে চাঁদ-এর উপমা আসত না। আসত না 'টীট' বিশেষণের অমন মধুর ব্যবহার। ব্যবহৃত হ'ত না "রসিকরাজ" শব্দটি। অতএব একটি সুঠাম বাক্‌প্রতিমার ভিতর দিযে রূপায়িত হ'ল কবির আবেগ।

প্রেমে সুখ আছে মনে করে রাধা কৃষ্ণের অনুরাগিনী হয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখছেন প্রেমে সুখের চেয়ে দুঃখ বেশি, বেদনা অতলান্ত। এই দুঃখ-বহনেও কোন আপত্তি ছিল না যদি কৃষ্ণকে চিরকালের জন্য পাওয়া যায়। কিন্তু তা' তো হবার নয়। তাই

"সুখের লাগিযা এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥"

এখানে লক্ষ্য করি অতীত ও বর্ত্তমানের বৈপরীত্য ঘটানো হ'যেছে। অতীতের সব সুখ-আনন্দ আজ অবসিত, স্তিমিত। একসময়ে প্রেম-গীতি নিয়ত গুঞ্জরিত হ'ত কানে-কানে, আজ তা স্তব্ধ। বিগত দিনের গতিশীলতা এবং এখনকার গতি-ক্লান্তির অদ্ভুত সংশ্লেষ। আমরা যেন দেখতে পাই বহু সাধের-গড়া ঘর পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে, রাধিকা তার সামনে বিষণ্ণ চিত্তে নতমুখে বসে আছেন। অতীতের স্মৃতিচারণা গানের সুরে

উৎসারিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়-গম্য রূপ ও অশরীরী ভাবনার সমবায়ে গড়ে ওঠা বাক্-প্রতিমায় রূপ লাভ করেছে রাধার অতলান্ত বেদনা।

আবার বর্ষারাতের বর্ণনায় জ্ঞানদাস লিখেছেন

"রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।"

বর্ষার রূপ শব্দে এবং ধ্বনিতে কায়াধারণ করেছে। এর মূলে রয়েছে ভিন্ন করণকৌশল। 'ন' এবং 'ই' ধ্বনির অনুপ্রাস। অনুপ্রাস ছন্দের ধাক্কায় দুলে উঠে ধ্বনির প্রতিমাসৃষ্টির সূত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন রেখেছে। আমরা কানে শুনেই "শ্রাবণ ঘনঘোর" রজনীকে প্রত্যক্ষ করি। ম ১

এবারে গোবিন্দদাসের দু' একটি পদ নেওয়া যাক। গোবিন্দদাস লিখেছেন

"কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছলছল লোচন
কেলিকে সমাগম কাঁপ॥"

কৃষ্ণকে আড়চোখে দেখে আনন্দ, তার সঙ্গে যুক্ত লজ্জা। আড়চোখে একটু দেখা, বহুদিনকার প্রত্যাশিত মিলন লগ্নের মুখোমুখি হওয়ার উল্লাসে শারীর শিহরণ প্রতিমার রূপ ধারণ করেছে। উচ্ছ্বাস এবং লজ্জা, বুঝিবা তার সঙ্গে বহুদিনকার মিলন-বাসনার সমাগত মুহূর্তে উল্লাসের ভাবে দেহ-মন-প্রাণের স্পন্দন একটি ছত্রে পাওয়া গেল—"কেলিকে সমাগম কাঁপ।"

গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনা করেছেন এইভাবে

"নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥

চঞ্চল চরণ কমলদল ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি বহত অগোর॥
অবিরত প্রেম- রতনফল বিতরণ
অখিল মনোরথ পুর।"

সুন্দর বাক্-প্রতিমা। চৈতন্যের রূপের প্রচ্ছদে "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত" শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করি। একটু বিশ্লেষণ করা যাক। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল চৈতন্যের চোখ দুটি যেন সজল মেঘের মতো অবিরল ধারাবর্ষণ করছে—এইটি প্রেমাশ্রু। মেঘের ধারাবর্ষণে গাছের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, মুকুলোদ্গমে রোমাঞ্চিত হয়, তেমনই প্রেমের আবির্ভাবে চৈতন্যদেবের মধ্যে নবমঞ্জরীর মতো বিচিত্রভাবের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করি। এককালে যিনি দুর্দ্ধর্ষ নিমাই পণ্ডিত ছিলেন প্রেমের সর্বপ্লাবী অভিজ্ঞতায় তিনি নবজীবনবোধে উত্তীর্ণ হ'লেন। বর্ষার আবির্ভাবে কদমফুল যেমন রোমাঞ্চিত হয়, প্রেমের আবির্ভাবে চৈতন্যদেবও তেমনি রোমাঞ্চিত। অশ্রু, পুলক, স্বেদ তাঁর দেহে কি অপরূপ লাবণ্য সঞ্চার করেছে। মেঘ যেমন জলভার নিঃসৃত ক'রে অন্তঃশীল আবেগমুক্ত হয়, প্রেমের আবেগ তেমনি তরল হ'য়ে ঝরে পড়ছে নয়ন নীর আর "স্বেদ মকরন্দ" হ'য়ে। এইটে চোখে দেখি, এর আবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে। এরপরেই কবির তরঙ্গায়িত আবেগ আধার খুঁজেছে অন্য প্রতিমায়। গৌরকান্তি চৈতন্যদেব এবার উপমিত হ'লেন "অভিনব হেম কল্পতরুর" সঙ্গে। কথিত আছে, স্বর্গে কল্পতরু আছে। এই বৃক্ষের কাছে যে যা চায় তা-ই পায়। অবশ্য স্বর্গে যাওয়ার পুণ্য অর্জন করা চাই, বৃক্ষের কাছে প্রার্থনা করা চাই। কিন্তু চৈতন্যদেব "অভিনব হেম কল্পতরু" এখানে "অভিনব" শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতো 'অভিনব' শব্দটির কবিতার অনন্য পরিবেশে সামান্যার্থকে ছাড়িয়ে গেছে, অনর্পিত বস্তু অযাচিতভাবে যিনি আচণ্ডালে দান করেন তিনি অভিনব কল্পতরু,—এমনটি পূর্বে কখনও দেখি নি। এখানে চৈতন্যদেবের অনন্যতা। আর এই কল্পতরু স্থাবর নয়—এর কাছে কিছু চাইবার জন্য পুণ্যের জোর কাউকে আসতে হয় না, নিজের গুণে অযাচিতভাবে আদ্বিজচণ্ডালে প্রেম

বিতরণ করে বেড়ায়। যে যুগে সংস্কারের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল মানুষের জীবন, নানারকম ভেদবুদ্ধির আল দিয়ে খুপরী কাটা ছিল জীবনধারা, সেইসময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব আপামর জনতাকে প্রেমদান অভিনব বৈ কি—মানুষের অন্তরালবাসী পুরুষের প্রেম-পিপাসা চরিতার্থ যিনি করেছেন তাঁকে "অভিনব কল্পতরু" ছাড়া আর কি বলব?

এই কবিতায় চৈতন্যদেবের হেমকান্তি নৃত্যশীলরূপ, ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট গুঞ্জনকারী ভ্রমরদের মতো প্রেমে-আকৃষ্ট ভক্ত-সম্প্রদায়ের মহাপ্রভুর স্তবগান যেন চোখে দেখি, কানে শুনি ঘ্রাণ গ্রহণ করি। মোটের উপর এই বাক্-প্রতিমায় দৃশ্য, ধ্বনি, ঘ্রাণ, স্বাদ বিচিত্র ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে কবি অখণ্ডবোধে বেঁধে দিয়েছেন। এর প্রচ্ছদে বৃন্দাবনের চিরকিশোরকে যেন উপলব্ধি করি। বহু উপকরণের সমাহারে অখণ্ড প্রতীতি জাগিয়েছেন কবি, চৈতন্যদেবের ভাবোন্মত্ত মূর্তি এবং চরিত্র জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। বাক্-প্রতিমায় ফুটে হ'য়েছে মহাপ্রভুর করুণা, উদারতা, প্রেম ও ভক্তি।

আরো একটু লক্ষ্য করবার আছে। কবিতার প্রথমাংশে "বিকশিত ভাবকদম্ব" পর্যন্ত চৈতন্যদেব একা, তার পরেকার অংশে দেখি বহুজন পরিবৃত শ্রীচৈতন্যকে। ভাবপরিমণ্ডল অনেক বিস্তৃত। অপ্রমেয় প্রেমের ধারা নির্ঝরে কতজন বাঞ্ছিত ফল পাওয়ার জন্য, একটু স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন,—"জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার"।

আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। বৈষ্ণব পদাবলীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ পদ বিচার করলে সুঠাম বাক্-প্রতিমার সাক্ষাৎ মিলবে। কোথাও অলঙ্কৃত কোথাও বা নিরলঙ্কৃত, বিশুদ্ধ আবেগের সংবেদনার শক্তির উপর নির্ভরশীল, যেমন, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু"। কবিদের বাক্-প্রতিমার সাধারণ বৈশিষ্ট্য দৃশ্য এবং ধ্বনি সংবেদনা। কত তার রকম ফের। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক হ'য়েও ঠারে-ঠোরে ইন্দ্রিয়াতীতের আভাস দেয়। এখানেই বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যমূল্য, রসাস্বাদনের চাবিকাঠি। এর জন্য বৈষ্ণব হওয়ার দরকার নেই। কেবলমাত্র কাব্য বোধটুকু থাকলেই যথেষ্ট—Art form এর দৃষ্টিকোন থেকে চিনতে পারলেই চলে। তাহলে বুঝব রূপচেতনা, প্রেমবোধ, মনস্তত্ত্ববোধের শিল্পায়িত রূপ বৈষ্ণব পদাবলী।

বৈষ্ণবকাব্য প্রসঙ্গে ঈশ্বরপ্রেমের কথা প্রায়শঃ শুনতে পাই। বৈষ্ণবরা বলেছেন, "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, হেন প্রেম নৃলোকে না হয়"। মানবীয় প্রেমের আর্তি থেকে তা পৃথক, কিন্তু আমাদেব কাব্য-সংবেদনা ভিন্ন। বৈষ্ণবরা প্রেমেরই কবি। বাধা কৃষ্ণের প্রেমেব পবতে পরতে নরনারীব প্রেম, মানবীয় প্রেম কাব্য ভাষায় তাঁবা বুনেছেন। প্রেম অভিজ্ঞতার শিল্পিত রূপ পদাবলীতে দেখতে পাই। Art form-এব বিচার বিশ্লেষণে এমন সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না।

['বাক-প্রতিমা' শব্দটি বর্তমানে বহু সমালোচক অক্লেশে ব্যবহার করছেন। মনে রাখা দরকার, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বসুই সর্বপ্রথম এই শব্দটি বাংলা সাহিত্যে নতুন অর্থবহতায় ব্যবহার করেছেন। সম্পাদক : উত্তরসূরি]

ভারতচন্দ্রে সুফী প্রভাব

সত্যনারায়ণ দাস

ভারতচন্দ্রের কাব্যের অশ্লীলতা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে অনেককেই ভাবিয়েছে। কেউ কেউ এর জন্য কবির মানসিকতাকে দায়ী করেছেন; কেউ কেউ যুগের অবক্ষয়ের চিত্র দেখেছেন এর মধ্যে। ভারতচন্দ্রেব ব্যক্তিত্বে যাঁরা ধর্মভাব দেখেছেন, ধর্মসমন্বয়ের হোতা হিসেবে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা অনেকেই এই অশ্লীলতার কারণ খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন—অনেকেই বিদ্যাসুন্দরকে রূপক কাব্য হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাবতচন্দ্রেব কাব্যের অশ্লীলতা আলোচনা প্রসঙ্গে এ যাবং সকলেই একটা কথা ভুলে থেকেছেন যে, এই অশ্লীলতার পিছনে ফার্সীসাহিত্যেবও কিছু প্রভাব থাকতে পারে। ভাবতচন্দ্র দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফার্সী শিখেছিলেন, সেকথাই শুধু এখানে স্মরণীয় নয়, আরো দু একটি তথ্যও এ প্রসঙ্গে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবির জন্মভূমিতে ইসলামী সংস্কৃতির একটি ধাবা বহুকাল আগে থেকে প্রবাহিত ছিল। সুকুমার সেন বলেছেন, পশ্চিমবাংলায় ইসলামি পীঠস্থান পাণ্ডুয়া ছিল দুটি। প্রথমটি শাহ-সূফীর আস্তানা ত্রিবেণী পেঁড়ো, দ্বিতীয় পেঁড়ো ছিল ভুবশুটে। 'কবি ভারতচন্দ্রের নিবাস এই পেঁড়োরই উপকণ্ঠে। দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরশুট-মান্দারণ খুব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপদ। এখানে সূফী খাঁ বা ইসমাইল গাজীকে উপলক্ষ্য করে একটি পীঠস্থান গড়ে উঠেছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে।'[১] শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলে ইসলামি সাহিত্যেরও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।[২] কাজেই অনুমান করতে পারি, যে কবি নিজে ফার্সী জানতেন এবং যিনি ইসলামি সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বড়ো হয়েছেন তাঁর কাব্যে ফার্সী তথা ইসলামি সাহিত্য কিছু ছায়া ফেলবেই। উপরন্তু, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাও ইসলামী সংস্কৃতির প্রসাদ বঞ্চিত ছিল না। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বৈত-জীবনের কথা বলেছেন।[৩] বাইরে দিল্লী-আগ্রার মুসলিম রাজপুত সভার অনুকরণ, অন্তরে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য

সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ফার্সী সাহিত্যেরও একটা স্থান ছিল ধরে নিতে পারি। ভারতচন্দ্রের কাব্যের নিরাবরণ অশ্লীলতা এই ফার্সী সূত্র থেকে এসেছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে যাঁরা শুধু সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিফলন দেখেছেন—তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে আমরা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবেই যেন দেখতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় রুচির প্রকাশ দেখেছেন কেউ কেউ ভারতচন্দ্রে, কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের কাব্যের রুচি দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রুচি-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। ভারতচন্দ্রের চরিত্রের সাত্ত্বিকতার দিকটি প্রমথ চৌধুরী চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, আরো অনেকেই স্বীকার করেছেন কবির এই বৈশিষ্ট্য। কাজেই দায়ী করা হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রকে কি অবক্ষয়-গ্রস্ত সমাজের প্রতিভূ বলা চলে? রাজনীতিবিদ্ ও শাসক হিসেবে তাঁর নিশ্চয় অনেক ত্রুটি ছিল, কিন্তু তিনি কি পতনশীল সমাজের প্রতিনিধি? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে কিন্তু একথা সত্য বলে মনে হয় না। শোনা যায়, রামমোহন রায়ের জীবনযাত্রাতেও এই রকমের দ্বৈতসত্তা কাজ করত। সুতরাং বাইরে মুসলিম সংস্কৃতির অনুকরণ করতেন বলে কৃষ্ণচন্দ্রকে দোষ দিই কি করে। কূটনীতিবিদ কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য শাসনের বা রক্ষার জন্য কোনো হীন কাজ হয়ত করে থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁর তো অন্যান্য অনেক গুণও ছিল। দীনেশচন্দ্র সেন, তাঁর নিন্দা করলেও একথা স্বীকার করেছেন[৪] যে কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে স্থপতিবিদ্যা, মূর্তিশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র নিজেও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সভায় দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ধর্ম—এ সবের চর্চা হত। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে তাঁর সভার পণ্ডিতদের সঙ্গে ন্যায়-দর্শন-ধর্ম বিষয়ে বিচারে সমর্থ ছিলেন। কাজেই কেবলমাত্র অপসংস্কৃতির ধারক তাঁকে বলা চলে না। আর সেই কারণে ভারতচন্দ্রের কাব্যের তথাকথিত রুচিহীনতার জন্য শুধু সমাজ পরিবেশকেই দায়ী করা চলে না—অন্য কোনো কারণ অনুসন্ধান করতে হয়।

২

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ফার্সী মসনবী রীতির কাব্যের তথা স্থফী

কাব্যের প্রভাব আছে। ভারতচন্দ্র স্ফী কাব্যাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন —স্ফী কাব্যের সঙ্গে গঠনগত মিল এবং পূর্বতন মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে অমিল থেকে তা বোঝা যায়। তিনি যে তাঁর কাব্যকে 'নব রসতর'[৫] বলেছেন সে বোধহয় এই কারণে। তবে কাব্যটিকে তত্ত্বরূপ দেওয়ার কোন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। মুসলমান আবহাওয়া-পুষ্ট রাজসভার জন্য কাব্য রচনার সময় মুসলমান কাব্যাদর্শ গ্রহণে কবি দূষ্য কিছুই দেখতে পান নি। বরং নতুন পথের পথিক বলে কবি গর্ববোধই করেছিলেন। স্ফী কাব্যের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের মিলগুলি আমরা দেখাব এবং এভাবে দেখতে পাব কাব্যটির সুনাম-দুর্নাম সব কিছুর জন্য দায়ী আসলে এই স্ফীকাব্যাদর্শ।[৬]

ফার্সী এবং ভারতীয় স্ফী কাব্যে প্রেমকেই পরমাত্মা বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এই পরমাত্মা স্ত্রীরূপে কল্পিত। রুমী, জামী, শাদী, হাফিজ এবং ভারতীয় মুল্লা দাউদ, মঞ্জন বা জায়সীর কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ফার্সী কাব্যে নায়িকার নাম শোনামাত্র নায়ক দরবেশ বা ফকীরের বেশ ধারণ করে তার সন্ধানে বহির্গত হয় এবং নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার পর তাদের মিলন ঘটে। এই কাব্যে নায়কের প্রেমের তীব্রতা বেশি। কাহিনীগত এই বৈশিষ্ট্যটুকু বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও দেখা যায়—এ কথা বলাই বাহুল্য। সুন্দর ভাট মুখে বিদ্যার নাম শোনামাত্র তার সন্ধানে বহির্গত হয়েছে। স্ফী কাব্যে মিলন সাধনের জন্য একটি মধ্যস্থ পাত্র দেখা যায়, জায়সী 'পদ্মাবৎ' কাব্যে আছে শুক পক্ষী, ভারতচন্দ্রে হীরা মালিনী। শুকপক্ষীর কথা ভারতচন্দ্রও ভুলতে পারেন নি। এজন্য কাব্যের প্রথম দিকে সুন্দর শুকের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনারত। শেষদিকে শুকই সুন্দরের পরিচয়-প্রদানকারী।

স্ফী কাব্যের একটি বিশিষ্টতা নায়িকার রূপবর্ণনা। এটি নখ-শিখ-বর্ণন নামে পরিচিত—কেননা নায়িকার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, সমস্ত কিছুর উপমা-সমৃদ্ধ বর্ণনা থাকে। সমালোচক বলেছেন .

'নখ-শিখ বর্ণন সভী কবিয়োঁ কা সমান হোতা হৈ। পৃথক পৃথক অঙ্গো কী বনাবট ঔর সুন্দরতা উনকে অনুরূপ আভূষণ, রূপাঙ্কণ, পরিধান, বিবিধ অবয়বোঁ ঔর অঙ্গো কী চেষ্টাএঁ তথা উন সবকে ব্যাপক প্রভাব কা নিরূপণ ভী

নখ-শিখ বর্ণন মেঁ কিয়া ভাবতা হৈ। সৌন্দর্যোৎকর্ষ দিখানে কে লিএ উপমান 'ভী অধিকতর বন্ধে হুএ ঔর নিশ্চিত সে প্রযুক্ত কিয়ে জাতে হৈঁ।[৭]

এই নখ-শিখ-বর্ণনার পাশে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাব রূপ বর্ণনা রাখলে যথেষ্ট মিল নজরে পড়ে। ভারতচন্দ্রের সমালোচকেরা বিদ্যার রূপবর্ণনা সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন—কেবলই বাহ্য বর্ণনা, কেবলই রূপ, গুণের কথা স্থান পায় নি। উপরন্তু, 'ভারতচন্দ্র অলঙ্কাবেব অতিশয়তাকে এক চূড়ান্ত স্তরে টেনে নিয়ে গিয়ে আসর মাত করে ফেলেছেন।'[৮] সূফী কবিদেব নখশিখের মানদণ্ডে বিচাব করলে এই অতিশয়তা আর অতোটা আতিশয্য বলে মনে হবে না। সেইসঙ্গে একথাও বোঝা যাবে, ভারতচন্দ্রেব রূপ বর্ণনা কেন মঙ্গলকাব্যেব অন্যান্য কবিদের বর্ণনা থেকে আলাদা।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেখা যায়, সুন্দব বিদ্যাব সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে—নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রাণ-সংশয় হয়েছে। এটিকেও সূফী প্রভাব বলে মনে কবতে পারি। সূফী সাধকদের বক্তব্য হল, কষ্টের মধ্য দিয়ে তবেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।[৯] মনসুব অল হল্লারা স্পষ্টভাবেই একথা বলেছেন। আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন—আমার ঘরে বেদনা ছাড়া আর কিছু নেই।[১০] জায়সীতেও এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে, সেখানে দেখা যায়, রাজা রত্নসেন পদ্মাবতীর জন্য প্রচুর দুঃখ স্বীকার করেছেন, তাকে শূলে চড়াবারও উদ্যোগ কবা হয়েছিল। দৌলৎ কাজির[১১] লোর ও চন্দ্রানীর জন্য কষ্ট স্বীকার করেছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেখা যায়, রাজসভায় আনীত সুন্দব বিদ্যার একনিষ্ঠ প্রেমিক। সে বলেছে 'সেই সার কেবা আব যাব কার কাছে।' সে বিদ্যাময়, বিদ্যা তার জাতি, প্রাণ, 'তপ, জপ, যজ্ঞ, যাগ, ধন ধ্যান জ্ঞান'।[১২] তাকে মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কালী তাকে বাঁচিয়েছিল। এটিও সূফী কাব্যের কাঠামো। পদ্মাবতের 'রত্নসেন সূলীখণ্ডেব' ঘটনাব সঙ্গে এর বেশ মিল রয়েছে। পদ্মাবতে দেখা যায়, শূলে দণ্ডিত রত্নসেনের হত্যা দেখার জন্য যখন রাজা ও অন্যান্যেরা সমবেত তখন রত্নসেন পদ্মাবতীর রূপ ধ্যান করে চলেছে। এবং সেখানে মহাদেব এবং পার্বতী ভট্ট ভোট্য ও ভট্টিনীর রূপ ধারণ করে এসে তাকে উদ্ধার করেছেন, পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেনের বিবাহ দিতে

তখন গন্ধর্বসেনের আব কোনো আপত্তি হয় নি। মহাদেবই পূর্বে রত্নসেনকে এপথে চলার উপদেশ দিয়েছিলেন। স্মরণ কবা যেতে পারে, বর্ধমান যাত্রাক্ক প্রাক্কালে মা-কালী সুন্দরকেও আশ্বস্ত করেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সুন্দরকে তিনিই রক্ষা করেছেন।

ফার্সী কাব্যে নগ্ন সম্ভোগের চিত্র আছে। এই বর্ণনা অনেক সময়ই অশ্লীল। ভাবতীয় সুফী কবিরা ফার্সী রচনাব এই বিষেশত্বটি গ্রহণ করেছেন। সব সুফী কাব্যেই আদিবস বহুল সম্ভোগ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ফার্সী কবিবা এবং ভাবতীয় সুফীরাও এব মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখেন নি। তাদেব কাছে প্রেমই উপাস্য। লৌকিক প্রেমকেই তাবা অলৌকিক প্রেমেব সোপান বলে মনে করেছেন। 'য়ুসুফ জুলেখাব' কবি স্পষ্টতই বলেছেন—লৌকিক প্রেম হল প্রারম্ভিক বর্ণমালা, সাংসাবিক প্রেমই ঈশ্ববীয প্রেমে পরিণত হয়, 'ইশ্‌ক মজাজী' হয় 'ইশ্‌ক হকীকী'।

Drink deep of earthly love, that so my lip,
May learn the wine of holier love to sip [১৩]

এজন্য সম্ভোগ বর্ণনায উল্লাস আছে, বিভোবতা আছে, শৃঙ্গাবেব নগ্ন চিত্রণ আছে, নাযক-নায়িকাব কামাতুবতা আছে।

ভারতচন্দ্রেব সম্ভোগচিত্র যে এই সুফীকাব্যের প্রভাবজাত, একথা আমরা আগেই বলেছি। ভাবতচন্দ্র কুপ্রবৃত্তিব উদ্দীপনার জন্যই বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন এবং এ কাব্যে একারণেই আদি রসেব প্লাবন বইযে দিয়েছিলেন—এ অনুমান সত্য নাও হতে পাবে। এমনও হতে পারে যে, আদিরসেব এই চিত্রণেব জন্য তিনি অভিযুক্ত হতে পারেন, এ ধাবণাই তাঁর ছিল না। সুফী সাধকের কাব্যে আদিরসের প্রাবল্য দেখে প্রেম কাব্যেব একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলেই হয়তো এটিকে তাঁব মনে হয়েছিল। তবে একথা ঠিক লৌকিক প্রেম থেকে অলৌকিক প্রেমে উত্তরণের আভাস তাঁর কাব্যেব কোথাও তিনি দেন নি। তার জন্য ভাবতচন্দ্রকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। সুফী কবিবাও অনেক সময় লৌকিক প্রেমেরই পারবশ্য স্বীকাব করেছেন, লৌকিক পক্ষই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে, আধ্যাত্মিকতা চাপা পড়ে গেছে।[১৪] যদি দেহ মিলনের আধ্যাত্মিকতা ভারতচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে থাকেন, তার জন্য তাঁকে

দোষ দেওয়া চলে না। তিনি একটি বহু প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত কাব্যাদর্শের অনুবর্তন করেছেন মাত্র।

১, ইসলামি বাঙ্গলা সাহিত্য পৃঃ ১০৬

২ ঐ, পৃঃ ৪৪

৩. The Court of Raja Krishna Chandra of Krishnanagar, কৃষ্ণনগর কলেজ শতবার্ষিকী গ্রন্থ (শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'কবি ভারতচন্দ্র' গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৮৬-৮৭

৫, সেই আজ্ঞামত কবি রায়গুণাকর।

অন্নদামঙ্গল কহে নব রসতর। (গ্রন্থসূচনা)

৬ দীনেশচন্দ্র বটতলার লয়লামজনুর সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের দু একটি মিল দেখেছিলেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃ' ৪৯০)—সে কথা এখানে স্মরণীয়।

৭. নিজামুদ্দীন এন্‌সারী, সূফী কবি জায়সী কা প্রেম নিরূপণ পৃ ৮০

৮. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কবি ভারতচন্দ্র পৃ ৩১৩

৯. দ্র M A. Shushtery, Outline of Islamic Culture, P 35

১০. তাঁর একটি গজল যে হেজ্রা রানা দর আ অজ দরে কাশা নয়ে যা।

কে কসে নেস্ত বজুজ দর্দে তো দরপা নয়ে মা।

—দীবানে গৌসুল আজম, পৃ ১৭

১১. দ্র· সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, কবি দৌলৎ কাজির সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী, (সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম খণ্ড)।

১২ সুন্দরের এই একনিষ্ঠা সব সময় দেখা যায় না। স্ত্রীরূপী কোটালের মোহেও সে ভোলে। এ জন্যই আমরা মনে করি, সূফী কাব্যের গভীরে ভারতচন্দ্র প্রবেশ করেন নি।

১৩ য়ুসুফ অ্যাণ্ড জুলেখা, গ্রিফিথের অনুবাদ, পৃঃ ২৪

১৪ জায়সীর পদ্মাবৎ সম্পর্কেই কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে এটি লৌকিক প্রেমের কাব্য। ডঃ রামকুমার বর্মা, হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস পৃঃ ৩১১, ড· বিমলকুমার জৈন, হিন্দী প্রেমাখ্যানক কাব্য, পৃ ২৮১।

ক'লকাতা গোড়ায় ক'লকাতায় ছিল কি?

সুকুমার সেন

১

আমার এ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের ছেলেভুলানো সরস কবিতার প্রতিবাদ নয়, ইতিহাস-শাস্ত্রাজীব পণ্ডিতদের কাছে একটি সমস্যা-উত্থাপন মাত্র।

বাল্যকাল থেকে ছোট বড়ো মাঝারি সব রকম ইতিহাসের বইয়ে পড়ে আসছি যে ইংরেজ কোম্পানি বঙ্গদেশে তিনখানি মৌজা জমিদারী নেবার অনুমতি পেয়েছিলেন তখনকার সুবেদার আজিম্-উস-সানের কাছে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি তখন ছিলেন বর্ধমান শহরে—শোভা সিং-রহিম খাঁর বিদ্রোহের সময়ে। এই তিনটি মৌজা গঙ্গার (ভাগীরথীর) ধারে, পূর্বতীরে। মৌজা তিনটির নাম সুতানটী (সুতানুটী), কলিকাতা ও গোবিন্দপুর। কিন্তু সর্বস্বীকৃত এই তথ্যের সম্বন্ধে এখন আমার একটু বিশেষ সন্দেহ জেগেছে। সে সন্দেহ হল, ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুনের আগে কোন দলিলে হস্তলিখিত অথবা ছাপা—কলিকাতা (ক'লকাতা) এই মৌজা বা গ্রাম নামটি এই প্রসঙ্গে কেন পাই না? ইউলের (Henry Yule) Hobson-Jobson-এর ক্রুক্ (William Crooke)-কৃত সংশোধিত সংস্করণে (১৯৪৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১৪৬) অবশ্য এই কথা আছে,

> "This avaricious disposition ths English plied with presents, which in 1698 obtained his permission to purchase from the Zamindar... .the towns of Soota-nutty, Calcutta and Goomopore, with their districts extending about 3 miles along the eastern bank of the River." Orme repr ii. 17.

অর্থাৎ এই লোভী ব্যক্তিকে (মানে আজীমুস্সানকে) ইংরেজরা প্রচুর উপাহন দিয়ে ১৬৯৮ সালে তাঁর অনুমতি পেয়েছিল জমিদারের কাছ থেকে

কিনে নিতে···গ্রামগুলি (মানে তিনটি গ্রাম), সুতানটী, কলকাতা আর গুমোপুব (মানে গোবিন্দপুর), প্রায় তিন মাইল জুড়ে, নদীর পূর্বতীরে। অর্মে (অর্থাৎ Robert Orme বিরচিত History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan) পুনর্মুদ্রণ (অর্থাৎ মাদ্রাজে ছাপা ১৮৬১-৬২) দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭।

অর্মেব বই প্রথম খণ্ড বার হয়েছিল ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুতবাং ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দেব সম্বন্ধে অর্মেব উক্তি দৃঢ় প্রমাণ হিসেবে ধর্তব্য নয়।

ইংবেজ কোম্পানিব বিলেতে লেখা চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ পর্যন্ত তাদেব কলকাতাব কার্যালয় ছিল Chuttanutte-তে। এব মাস আড়াইয়েক পবে ৮ই জুন থেকে ইংবেজ কোম্পানির কার্যালয়ের ঠিকানা Chuttanutte-ব পরিবর্তে হয়েছে Calcutta-য়।

সুতানুটী নামটি ইংরেজীতে নানা বানানে পাওয়া যায়। তারিখের ক্রম-অনুসাবে সাজালে এই পরম্পবা হয়,

১. ইংবেজেব কলমে

১৭০০ খ্রী Chutanutte

Chutanutty

১৭১১ খ্রী Chutty Nutty

Chittanutte

২ বাংলা (বা ফাবসী) থেকে ইংবেজেব কলমে

১৭৫৩ খ্রী Sootaloota

৩ বাঙালীব কলমে

১৭৫২ খ্রী সুতানুটী।

শেষেব বানান দুটি মিলিয়ে দেখলে গ্রামটিব আসল নাম পাওয়া যায় সুতালটী (বা সুতালুটো), অর্থাৎ যেখানে সুতোর লুট হয় কিংবা প্রচুর আমদানি হয়। (ইংরেজী বানান ধরলে ও দুটি ছাড়া নামটিব অনেক রূপান্তর কল্পনা করা যেতে পারে। ছুতিনতি, ছুতানাতা, ছুটিনটি, ছাতানাটি ইত্যাদি।) 'সুতালটী' সহজেই মুখের কথায় 'সুতানটী', বা 'সুতানুটী' হয়েছে।

২

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি গোবিন্দপুরে ইংরেজ কোম্পানি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। কোম্পানির আপিসও এইখানে উঠে এসেছিল। তারপর থেকে **Chuttanutty**-র বদলে **Calcutta** কোম্পানির হেডকোয়ার্টার অঞ্চল বলে চালু হয়।

কিন্তু এই Calutta নাম কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল? তিনখানি মৌজা বা গ্রামের তালিকায় তো তিনটির একটি বলে তো উল্লেখ কোথাও নেই COLLECATTE বা COLICOTTA or CALCUTTA-র। গোবিন্দপুর ও সুতানুটীর মাঝখানে অথবা গোবিন্দপুরের পাশে কলিকাতা (ক'লকাতা) বলে কোন স্থানেরই উল্লেখ নেই সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য কোন দলিলে। এমন কি ফোর্ট উইলিয়ম স্থাপনের পরেও যখন কলিকাতা (ক'লকাতা) নাম কোম্পানির ঠিকানা হয়েছে তখনও পাইলটদের চার্টে এই স্থানের নাম নেই। এ অনুল্লেখ বিস্ময়জনক। হবসন্ জবসনে (পৃ ৪৮৩) ১৭১১ সালের *English Pilot* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে গঙ্গার ধারে খিদিরপুর ('Kitherepore') গোবিন্দপুরের ("Govin Napore") অব্যবহিত পরে ভাটিতে। এ অংশটি এখানে উদ্ধৃত করি:

> "Then keep Rounding CHITTI POE (Chitpore) Rite down to CHITTY NUTTY Point (now Chutta nutty),
> The Rite below GOVER NAGARE (Govind-pur) is Shoal, and below the Shoal is an Eddy, therefore from Gover Nagore you must stand over to the Starboard-Shore and keep it aboard till you come up almost with the Point opposite to Kitherepore, but no longer". . .The English Pilot (of 1711) P 65.

অর্থাৎ, 'তার পর চিৎপুর ("চিতি পোএ") ঘুরে চল ঠিক চিতি নটি পয়েন্ট (এখন সুতানুটি)[১]. গোবৈরনগোরের (গোবিন্দপুর) ঠিক পরেই চটান (shoal)[২] এবং সেই চটানের পরেই এক ঘূর্ণি; অতএব গোবের নগোর থেকে তুমি নদীর ডান তীর ঘেঁসে চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তুমি খিদিরপুরের

(Kithere Pore) ঠিক বিপরীত দিকের পয়েন্টে পৌছও, তারপর আর (ডান তীর ঘেঁসে চালানো) নয়।'

গোবিন্দপুরের সংলগ্ন এই shoal টিই এখনকার গড়ের মাঠে পরিণত হয়েছে।

৩

নবাবের সরকারি মহাফেজে যে তিনটি মৌজার মধ্যে কলকাতার নাম যে আগে ছিল না তার ভালো প্রমাণ মিলেছে। এ প্রমাণ Hobson Jobson-এর মধ্যেই রয়েছে (পৃষ্ঠা ২২১) তা উদ্ধৃত করছি। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সম্পর্কে পাদরি লঙের (James Long) SELECTIONS FROM UNPUBLISHED RECORDS OF GOVERNMENT (FORT WILLIAM) FOR THE YEARS 1748—1767 (কলিকাতায় ছাপা, ১৮৬৯) থেকে এই উদ্ধৃতি।

"The Hooghly Phousdar demanding the payment of the ground rent for 4 months from January, namely

	R	A.	P
Sootaloota, Calcutta	325	0	0
Govindpoor, Picar	70	0	0
Govindpoor, Calcutta	33	0	0
Boxies	1	8	0

Agreed that the President do pay the same out of Cash "

অর্থাৎ হুগলী ফৌজদারের দাবী জানুয়ারী থেকে চার মাসের খাজনার জন্য, যথা।

সুতালুটা, ক'লকাতা	৩২৫ টাকা
গোবিন্দপুর, পইকর (Picar)	৭০ টাকা
গোবিন্দপুর, ক'লকাতা	৩৩ টাকা
বক্‌শিশ	১ টাকা ৮ আনা

স্থির হল যে প্রেসিডেন্ট এই টাকা নগদ জমা থেকে দিয়ে দেবেন। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে সুতালুটা (বা সুতানুটা) ও গোবিন্দপুর দুটি মৌজা-কেই কলকাতার ছাপ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ এইমাত্র হতে পারে যে এটি

পরগণার নাম। নবাবী সেরেস্তায় পাই সুতালুটা ও গোবিন্দপুর আর গোবিন্দপুরকে দু ভাগ করা হয়েছে—গোবিন্দপুর Picar (পইকর) ও গোবিন্দপুর (খাস)। এখন বিচার্য হচ্ছে—গোবিন্দপুর Picar-এর মানে কী? শব্দটি বাংলা নয়, ইংরেজীও নয়। সুতরাং মনে হয় ফারসী। ফারসীতে 'পই, পয়' শব্দের মানে হল পিছন, পশ্চাদ্‌ভাগ। 'পই (পয়) করদন্‌' মানে হল পিছনে ফেলে রাখা, পিছনে গাঁথা (to hamstring)। এর থেকে Picar শব্দটির মানে হয় পিছনের স্থান। অর্থাৎ Govindpoor Picar মানে গোবিন্দপুরের পিছনে সংলগ্ন চক বা মৌজা। [হয়তো বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত পাইকস্ত মানে বাইরের লোককে পাট্টা দেওয়া জমি (land let to non-resident tenants) শব্দটির অনুরূপ ছিল।] গোবিন্দপুরে যে অ-বাস্তভূমি যথেষ্ট ছিল তার প্রমাণ এখনকার মধ্য কলকাতা অংশে বাঁশতলা আর পটলডাঙার মতো নামের অস্তিত্ব। এই অঞ্চল প্রায় প'ড়ো ছিল বলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ধনী বাঙালীরা এইখানে জমি কিনে বড়ো বড়ো বাড়ি তুলে আর বাগানবাড়ি ফেঁদে বসবাস শুরু করছিলেন।

সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের নামান্তর কলিকাতা হওয়ার কারণটা কী? সুতনুটী বসতিময় গ্রাম ছিল, গোবিন্দপুরেও বসতি ছিল। গোবিন্দপুরের বসতি কিছু কিছু উঠিয়ে দিয়ে ইংরেজ কোম্পানি দুর্গ ও আপিস গড়েছিলেন। ও দুটি নাম ছেড়ে দেওয়া হল কেন তা পরে বলছি।

৪

এখন বিচার্য, 'কলিকাতা' এই স্থান নামটি কত আগে প্রথম পাই। এ প্রশ্নের উত্তর সহজ মনে হয়। অথচ আসলে খুব সহজ নয়। সহজ উত্তর হল, আবুল ফজলের আইন ই-আকবরীতে সাতগাঁ সরকারের অন্তর্গত একটি মহল (মহাল) উল্লিখিত আ ছ 'KLKT' বলে। স্বরধ্বনিবর্জিত আরবী প্রথায়— এই নামটিকে অনায়াসে ধরে নেওয়া হয়েছে Kalikata বলে। কিন্তু গোল হচ্ছে এইখানেই সমস্যার শেষ নয়। এই নামটির বদলে আর এক সমান (?) প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় 'TLP' অর্থাৎ' তলপা (বা এমন কিছু) পাঠ। তা ছাড়া পরবর্তী কালের পুথিতে আরও দুটি পাঠ মেলে 'Kln' (অর্থাৎ 'ক'লনা) আর 'Klt' (অর্থাৎ 'কলতা') (যদুনাথ সরকার মহাশয় মেনে নিয়েছেন 'Kļu'

পাঠ।) এই পাঠান্তরগুলি আবুল ফজলের সাক্ষ্যের জোর কমিয়ে দিয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে পাঠ হিসেবে প্রাচীন পাঠ, চতুর্ব্যঞ্জন KLKT সবচেয়ে গ্রহণীয় বলে মনে হয়। এই পাঠ গ্রহণের পক্ষে কিছু যুক্তিও আছে। কলকাতার উত্তর পূর্বে মাইল ৪।৫ দূরে নিমতে ('নিমিতা') গ্রামের অধিবাসী কৃষ্ণরাম দাস কালিকামঙ্গল ইত্যাদি কিছু কাব্যরচনা করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। তাঁর প্রথম কাব্য রচনা করা হয়েছিল শায়েস্তা খাঁর সুবেদারির সময়ে (১৬৬৪ থেকে ১৬৭৬, অথবা ১৬৭৯ থেকে ১৬৮৯—এই কালের মধ্যে)। আত্মপরিচয়ের উপক্রমে কৃষ্ণরাম লিখেছেন,

> অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
> কলিকাতা পরগণা তায়।
> ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্বকূল
> নিমিতা নামেতে গ্রাম যায়।[৩]

যে পুঁথিতে এই কথা মিলেছে সেটি কপি করা শেষ হয়েছিল ১১১৯ সালের শ্রাবণ মাসে, অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং কৃষ্ণরামের এ উক্তি লণ্ডের উদ্ধৃত কোম্পানির রেকর্ডের চেয়ে এক বছরের পুরোনো। এবং কৃষ্ণরামের উক্তি থেকেই বোঝা যাবে যে লণ্ডের রেকর্ডে সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের পর কলকাতার যে উল্লেখ সে কোন গ্রামের বা অঞ্চলের নাম বলে নয়, পরগণার নাম বলে। কৃষ্ণরামের উক্তি আবুল ফজলের দলিলে Klkt পাঠও সমর্থন করছে।

কলিকাতা পরগণার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন জাগে, এ নামে কোথাও কোন বিশেষ মৌজা (বা গ্রাম) ছিল কিনা। মৌজার (বা গ্রামের) নাম ধরেই যে পরগণার নাম হয় এমন কথা নেই। 'হাবেলী' নামে পরগণা আছে বর্ধমান জেলায় একাধিক। কিন্তু ও নামে কোন গ্রাম নেই। অথবা থাকার কোন প্রমাণ নেই। 'গোপভূম' 'সেনভূম' পরগণার নাম, কিন্তু ও কোন বিশেষ মৌজার (বা গ্রামের) নাম নয়। আমার অনুমান কলিকাতা (ক'লকাতা) এই পরগণা নামটি এখানে অঞ্চল বিশেষেরই ছিল। আসলে নামটি যে অঞ্চল বিশেষের ছিল তার হেতু নামটির বিশেষ তাৎপর্যে নিহিত ছিল বলেই আমার ধারণা। "পরগণা"র মধ্যে অন্তত দুটি কলকাতা পাচ্ছি, একটি আমাদের কলকাতা থেকে অল্প দূরে, আর একটি একটু বহুদূরেও।

আমাদের কলকাতার উজানে ও ভাটিতে দুটি কলকাতা স্থানের উল্লেখ রয়েছে ভ্যান ডেন ব্রুকের (Van den Broucke) ম্যাপে (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে)।[৪] উজানে স্থানটির নাম দেওয়া আছে Collecatta (অর্থাৎ 'কলিকাতা')। দ্বিতীয় নামটি আছে Calcuta (অর্থাৎ 'কলকাতা')। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রথম স্থানটিই প্রাচীনতর। এটি নিমতেরই কাছাকাছি।

আমার মনে হয় কলিকাতা নামটির বহুত্বের কারণ নিহিত আছে নামটির অর্থের মধ্যে। সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' নামের অর্থ নিয়ে মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অনেককাল পরে শ্রীরাধারমণ মিত্র মহাশয় সুনীতিবাবুর প্রবন্ধ নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা করেছিলেন।[৫] কৌতূহলী পাঠক 'এক্ষণ' পত্রিকার পুরোনো সংখ্যায় তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। আমি সে দিকে যাচ্ছি না। সুনীতিবাবু ধরে নিয়েছিলেন নামটি বাংলা শব্দে গড়া। আমার অনুমান নামটি আরবী (এবং ফারসীতে ব্যবহৃত) শব্দে গড়া। (সুতরাং গুরু-শিষ্য আমরা ভিন্নবাদী হলেও বিবাদী নই।) আরবী শব্দ 'কলি' (qali') মানে নির্বোধ, আর কত্তা (qatte) মানে দস্যু, হত্যাকারী (বহুবচন)। তাহলে স্থান নামটির মানে হয় —বোকা বজ্জাতের আড্ডা। এই ব্যুৎপত্তি মানতে হয় জাহ্নবীর পূর্ব্বকূলে এই অংশের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে। এ অংশে এমন অনেক খাড়ি ও খাল আছে যেখানে জল-দস্যুদের আড্ডা ছিল। ভ্যান ডেন ব্রুকের ম্যাপে যেখানে Collecatte (= কলিকাতা) দেখানো আছে সেখানে একদা Rogues Reach (অর্থাৎ বদমায়েসের ট্যাঁক) বলে পরিচিত ছিল।[৬] ইংরেজ কোম্পানি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে তার কাছেই "Rogues River"[৭] ররণের খাড়ি বা খাল ছিল।

শিয়ালদহ (ক'লকাতার বিশিষ্ট উচ্চারণে 'শ্যাল্দা',—শ্যাওলা দ' থেকে, শিয়াল দ' থেকে নয়—) এই অঞ্চল এবং ক্রীক রো (Creek Row) এই রাস্তা নামটি অতীত দিনের সেই Rogues River-এর স্মৃতির জের টেনে এসেছে। এমনও হতে পারে যে সেই খাড়ির পাশের জায়গাকে লোকে বলত 'ক'লকাতা'। এই সঙ্কীর্ণ স্থানের নামটির সঙ্গে পরগণার নামের মিল থাকাতে 'কলিকত্তা' (Calcutta) নামটি ইংরেজ কোম্পানির অধিকৃত ভূমির সাধারণ নামরূপে সহজেই গৃহীত হয়েছিল।

অতএব শেষ পর্যন্ত সঠিক বলা গেল না কলিকাতা কলিকত্তা ক'লকাতায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে কিনা। তবে আশা করি এটুকু সকলে স্বীকার করবেন যে কলিকাতা (ক'লকাতা) নামে কোন মৌজা (বা গ্রাম) সুতানুটী-গোবিন্দপুরের সংলগ্ন ছিল না।

এইটুকু প্রতিপাদনই আমার এই লেখার উদ্দেশ্য। এখন ইতিহাসাজীব পণ্ডিতদের মতামতের প্রতীক্ষায় রইলুম॥

পাদটীকা

১ বন্ধনী স্থিত অংশ সম্পাদকের যোজনা বলেই ধরতে হবে।

২ অর্থাৎ জল অত্যন্ত অগভীর।

৩ মদীয় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড অপরার্ধ তৃতীয় সংস্করণ পৃ° ৩০৭-৩০৯ দ্রষ্টব্য।

৪ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, The History of Bengal, Volume I [৩০৮ দ্রষ্টব্য।]

৫ 'এক্ষণ পত্রিকায় (১৩৭৬ সালের চতুর্থ সংখ্যায়) শ্রীরাধারমণ মিত্রের প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা ৬৭) দ্রষ্টব্য।

৬ Hobson-Jobson পৃষ্ঠা ৩০৮ দ্রষ্টব্য।

৭. হবসন জবসনে এই প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা সমাজ

প্রদীপ রায়

উনিশশতকের প্রথমার্ধে কলকাতা সমাজ আধুনিক বাংলা তথা ভারত-ইতিহাস সৃষ্টিতে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—একথা ইতিহাস-স্বীকৃত সত্য। আলোচ্যকালে এই কলকাতা সমাজে নানা বিচিত্র শক্তির সমাবেশ ঘটেছে, বিভিন্ন শক্তি সমাজনিয়ন্ত্রণের সার্বভৌম ক্ষমতালাভের প্রত্যাশায় পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণও হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, অবশ্য এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যে নিরবচ্ছিন্ন একথা বলা চলে না। কখনও কখনও বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে এক শক্তি অনায়াসেই অপর এক শক্তির সঙ্গে চলমান দ্বন্দ্বকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে, মৈত্রী স্থাপন করেছে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আবার সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবাদমান শক্তিগুলি যে সর্বদাই সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছে বা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে যুযুধান শক্তি যে অপর একটি ক্ষেত্রেও পরস্পর বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। সমাজ-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে, সে কারণে, শক্তি সমাবেশও ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও প্রকৃতি লাভ করেছে। এক কথায় বলা যায় পরস্পরের সম্মুখীন তৎকালীন শক্তিগুলি যেমন ছিল বিচিত্র তেমনি বিচিত্র ছিল তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মিলনের ইতিহাস। এই বিচিত্র ইতিহাসই আধুনিক বাংলা তথা 'ভারত' ইতিহাসের বৈচিত্র্যকে করে তুলেছে আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ।

উনিশশতকের সূচনায় কলকাতা-সমাজে দেশী ও বিদেশী উভয় সম্প্রদায়, একে অপরের দৃষ্টিগোচরে বসবাস করেছে বলে পরস্পরের নৈকট্যও লাভ করেছে। দেশী সম্প্রদায়ের প্রধান অংশ বেনিয়ান, দেওয়ান, মুৎসুদ্দী, জমিদার এবং তাদের আশ্রিত, অনুগৃহীত, বিভিন্ন জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত, আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃটিশ কর্মচারী এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত ইয়োরোপীয় বণিকদের নিয়ে গঠিত বিদেশী সম্প্রদায়। দেশী সম্প্রদায়ের ধর্ম—

হিন্দুধর্ম এবং ইসলামধর্ম, বিদেশী সম্প্রদায়ের ধর্ম—খ্রীষ্টধর্ম। দেশী সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মাবলম্বী অংশ এ-সময় নানা কার্যকারণে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। সে কারণে, সাধারণভাবে, এ-সময়ের দেশীসম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মাবলম্বী অংশ সমগ্রের ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে অগ্রসর হয়েছে, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রত্যক্ষ শাসনও প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে কম্পানীর নীতি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে হস্তক্ষেপ না করাই ছিল এই নীতির ঘোষিত লক্ষ্য। বস্তুত অনেকক্ষেত্রেই ভারতীয় ধর্মাচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতি অনুযায়ী নানা আচরণ প্রবণতা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী শাসকবর্গের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বড় বড় হিন্দুপর্ব ও মহোৎসবাদির দিনে ইংরেজ-দুর্গে তোপধ্বনি করা হ'ত। যুদ্ধে জয়লাভ হ'লে ভারতের ইংরেজ সরকারের পক্ষে কালীঘাট প্রভৃতি বড় বড় মন্দিরে পূজারীদের মাধ্যমে পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ত।[৮] বিদেশী ইংরেজ শাসকবর্গের এরূপ আচার। পরোক্ষে ভারতীয় ধর্মাচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধার মনোভাবই ব্যক্ত করে। সে-সময় ভারতের ইংরেজ শাসনাধীন অংশে খ্রীষ্টধর্মপ্রচার এবং সে উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টধর্মযাজক প্রেরণের কথা কম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে ছিল অকল্পনীয়। তাদের এই আশঙ্কা ছিল, খ্রীষ্টান মিশনারী ইংরেজ অধিকৃত ভারতে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে অগ্রসর হলে এ-দেশের প্রজাসাধারণ তা ভাল-ভাবে গ্রহণ করবে না এবং তারই ফলে এ-দেশে ইংরেজ অধিকার বিঘ্নিত হতে পারে। যা হোক্, ভারতীয় ধর্মাচরণ ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি ইংরেজ সরকারের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী কলকাতা সমাজের দেশী অংশের রক্ষণশীল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে যে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অথচ পূর্ববর্তী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক নানক, কবীর, দাদূ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ভারতীয় ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে উদারদৃষ্টিসমূহ ব্যাপ্ত হয়েছিল তা অস্বীকার করে হেষ্টিংস এবং তাঁর পরবর্তী ইংরেজশাসকেরা বিচার ও আইনসংক্রান্ত যে সব সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন তার মূল ভিত্তি ছিল অনুস্মৃতি থেকে শুরু করে প্রায় সকল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যধর্মের নির্দেশক-নীতি সম্বলিত ধর্মশাস্ত্র। রচিত ও প্রকাশিত

হল হ্যালহেডের জেন্টু কোড (১৭৭৬), আর ইসলামের রক্ষণশীল চিন্তাধারা সম্বলিত হিদায়া পুস্তিকার পারসী ভাষায় অনুবাদ। ভারতীয় সমাজে এর ফল হল সুদূরপ্রসারী। শাসন কর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করে ভারতীয় সমাজের উদারনীতি-বিরোধী রক্ষণশীল অংশ সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করল।[২]

এদিকে ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে বঙ্গদেশে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এ (১৭৯৩) পরিণতি লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ গ্রহণ করে নবোদ্ভূত জমিদার শ্রেণী বঙ্গ-সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত অধিকার লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর প্রসাদভোগী এই জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণভুক্ত। অন্যদিকে কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর শ্রেণীর প্রায় সকল বিত্তহীন অসহায় ব্যক্তি ছিল নিম্নবর্ণভুক্ত। ফলে বৃটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশে সামাজিক বর্ণভেদ অর্থনৈতিক বর্ণভেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, সামাজিক বর্ণভেদের রূপ-কাঠামো প্রায় সম্পূর্ণ বজায় রেখে। সে-কারণে জাতিভেদ প্রথা যে উক্ত ব্যবস্থায় অধিকতর ব্যাপকতা ও দৃঢ়তা লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নাই।[৩] বস্তুত কম্পানী আমলের উপরিউক্ত দু'টি সংস্কার ভারতীয়দের জীবনে পূর্বোক্ত ধর্মসংস্কারকদের উদার চিন্তাধারাকে উদ্দীপ্ত না ক'রে রক্ষণশীল মনোভঙ্গীর জয়যাত্রায় ইন্ধন জুগিয়েছে। সুতরাং এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত হবে না যে কম্পানীর শাসনের প্রথম পর্বে প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে ভারতীয় ধর্মাচরণ ও সামাজিক আচরণে কম্পানী-সরকার হস্তক্ষেপ করেছে তবে সে হস্তক্ষেপ রক্ষণশীলতার অনুকূলে।

অন্যদিকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সনদ পুনর্গ্রহণের সময় ইংল্যাণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক, খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে আগ্রহী চার্লস গ্রান্ট এবং উইলবারফোর্স অন্যান্য কারণসহ ভারতীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু বৃটিশ অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে ইংরেজ সরকারের অনুমোদন লাভের জন্য চার্লস গ্রান্ট এবং উইলবারফোর্সের সকল প্রচেষ্টা সে-সময় ব্যর্থ হয়। কোর্ট অব ডিরেকটরস-এর অভিমত হল . The Hindus had as good a system of faith and morals as most people and that it would be

madnesss to attempt their conversion or to give them any more learning or any other description of learning than what they already possess" [৪]

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড, এই তিনজন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের সূত্রপাত করেন। উক্ত তিন মিশনারী কলকাতায় খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়েই দিনেমারদের অনুমতিক্রমে শ্রীরামপুরে তাঁদের ধর্মপ্রচারকার্য শুরু করেন। পীতাম্বর সিং নামে এক কায়স্থ সন্তানকে তারা সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তারপর উত্তরোত্তর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী-অধিকৃত ভূখণ্ডে কম্পানী বিরোধিতায় খ্রীষ্টধর্মপ্রচার আগে সম্ভপর হয় নি।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে পুনরায় সনদ প্রদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে ইংরেজ অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের সুযোগ সৃষ্টি এবং সে-উদ্দেশ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জোরদার হয়ে উঠে। উইলবারফোর্স খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দেন, উক্ত বক্তৃতায় হিন্দুদেবদেবী সম্পর্কে বিরূপ বক্তব্য ক'রে বলেন "Hindu divinities were absolute monsters of lust, injustice, wickedness and cruelty In short, their religious system is one grand abomination" [৪ক] ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলিও এ-সময় লর্ড সভায় খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের অনুকূলে বক্তব্য রাখেন। ভারতের ধর্মীয় ও নৈতিক অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-খণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে Lord Teignmouth (John Share) মন্তব্য করেন Only the strong ethical content of christianity could eradicate the deeply rooted deceit, obscenity, and tendency towards corruption"[৫]. অবশেষে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে এ-বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এ-দেশীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য কম্পানী-অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আইনানুগ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে দেওয়া হয়। ফলে ইংরেজ-অধিকৃত ভারত-

ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে এতাবৎকাল যে বাধা ছিল তা অপসারিত হল এবং স্বভাবতই খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশনের সম্যক্ তৎপরতা দেখা দিল। এ-সব মিশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে ব্যাপটিষ্ট মিশন, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটি, চার্চ অব ইংল্যাণ্ড এবং পরবর্ত্তীকালে স্কটিশ মিশন। উপরি-উক্ত মিশনগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ অবশ্যই ছিল, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে এবং ভারতীয় যে কোন ধর্ম কিরূপ নিকৃষ্ট তা প্রতিপন্ন করার বিষয়ে এঁদের পরস্পরের প্রতিযোগিতা লক্ষণীয় ছিল। ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে মিশনারীদের অশালীন বিরূপ মন্তব্যাদি কলকাতা সমাজের দেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্টীয় মিশনগুলির আগ্রাসী ধর্মপ্রচারে আইনানুগ সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করে কম্পানীর সরকার। এ-সময় খ্রীষ্টীয় কম্পানী-সরকারের ধর্মবিষয়ে অনুসৃত নীতি পরোক্ষভাবে দেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষণশীল শক্তির রক্ষণশীলতার ধর্মকে আরও দৃঢ় করেছে, কলকাতার দেশীয় সম্প্রদায় যেন এরই ফলে ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সনাতনী আচার। পদ্ধতিকে অধিকতর শ্রদ্ধা জানিয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত হয়েছে। অবশ্য মিশনারী বাগবিতণ্ডার ফলে কলকাতার দেশীয় সম্প্রদায় চিরাচরিত ধর্মাচরণ ও সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কে যে ইতিমধ্যে নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

কম্পানীর শাসনের প্রথম পর্বে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কম্পানীর সরকার যেমন হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেছে তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কম্পানীর সরকার প্রায় অনুরূপ নীতি গ্রহণ করেছে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে এরূপ নীতি গ্রহণের ফলে আরবী, পারসী ও সংস্কৃত-ভিত্তিক ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষাব্যবস্থা পুরাতন জমিদারদের অনুপস্থিতিতে আর্থিক আনুকূল্য ও পরিচালনার অভাবে ক্রমশই ধ্বংস হচ্ছিল। ইংরেজ শাসক ও ইয়োরোপীয় বণিকদের সংস্পর্শে নবোদ্ভূত জমিদার শ্রেণী, বিশেষত কলকাতা সমাজের বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, দেওয়ান প্রভৃতি জীবিকাশ্রয়ী ব্যক্তি প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ক্রমশ আস্থাহীন হয়ে পড়ছিল এবং বাস্তব প্রয়োজনে ব্যবসায় বাণিজ্যে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ইংরেজী শিক্ষা-গ্রহণে

আগ্রহী হয়ে উঠছিল। ইংরেজী শিক্ষায় এঁদের আগ্রহ দেখে উনিশ শতকের সূচনা থেকে কয়েকজন ফিরিঙ্গী কলকাতা শহরে ইংরেজী স্কুল স্থাপনা করেন। ক্রমাগত এ-সব স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ কম্পানীর সরকার শিক্ষা বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

ভারতীয়দের শিক্ষার ক্ষেত্রে কম্পানীর এই ঔদাসীন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস, জোনাথান ডানকান প্রমুখ কম্পানী-নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক বৃটিশ বণিকের সমর্থন লাভ করে নি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ওয়ারেন হেষ্টিংস ও জোনাথান ডানকান যথাক্রমে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মাদ্রাসা ও ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উভয়েই এ দেশীয়দের জন্য এ দেশীয় শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওয়ারেন হেষ্টিংস ও জোনাথান ডানকান এ দেশীয়দের জন্য যে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে এ দেশীয়দের সনাতনী মনোভাবের সহায়ক। উপরন্তু প্রাচ্যদেশের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম জোনস্ এর উদ্যোগে, ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ভারত-শাসন নিয়োগের পূর্বে ভারতের ভাষা, ভারতীয় আচার-আচরণ, ধর্ম ও ধ্যান ধারণা সম্পর্কে বৃটিশ সিভিলিয়ানদের পরিচিত করার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলীর উদ্যোগে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কলকাতা সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বৃটিশ প্রাচ্যবিদ্ এবং বাঙ্গালী পণ্ডিতদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে প্রাচীন ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস, বিশেষত গৌরবোজ্জ্বল বৈদিক যুগের ইতিহাস, উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এই সকল আবিষ্কারের ফলে স্বভাবতই বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা ভারতের সুমহান ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধর্মীয় অভিমানের বশবর্তী হয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন উইলকিন্স, জোনস, কোলব্রুক প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্ সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন এবং তৎকালীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত পুরাণ-ভিত্তিক নানা সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণের সংস্কার-সাধনে কম্পানীর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে ভারতের বৈদিক যুগের ধর্ম ও আচরণকে যুগোপযোগী করে এ-সংস্কার সাধন সম্ভবপর।

ভারতের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য খ্রীষ্টধর্ম ও ইয়োরোপীয় সামাজিক রীতি নীতির প্রবর্তন আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। এবং এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে ভারতীয় সমাজে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তা একরূপ নিশ্চিত।

অপরদিকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে সনদ পুনর্প্রদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লে চার্লস গ্রাণ্ট এ দেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারসহ শিক্ষা বিস্তারের এক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। উক্ত প্রস্তাবে অবশ্যই ইংরেজী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কম্পানী-অধিকৃত ভারত ভূখণ্ডে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ গুরুত্ব নির্দেশ ক'রে তিনি তার পুস্তিকায় যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন 'for every great purpose of the proposed scheme, the introduction and use of that (English) language would be most effectual, and the exclusion of it, the loss of unspeakable benefits and a just subject of extreme regret We shall also serve the *original design* with which we visited India, that design still so important to this Country—*the extension of our Commerce* our religion and our knowledge might be diffused over other dark portions of the globe where Nature has been more kind than human institutions This is the noblest species of Conquest, and wherever, we may venture to say, *Our principles and language are introduced, our Commerce will follow.*"[৬] উক্ত বক্তব্য স্পষ্টতই নির্দেশ করছে কম্পানী-অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডে ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের জন্য চার্লস গ্রাণ্ট এবং তাঁর সমর্থক উইলবারফোর্স যে ওকালতি করেছিলেন তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উক্ত সম্প্রসারণের যথোপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে চার্লস গ্রাণ্টের উপরি-উক্ত বক্তব্য স্বীকৃতি লাভ না করলেও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার-অ্যাক্টে ভারত-ভূমিখণ্ডে খ্রীষ্টধর্মপ্রচার বিধিসম্মত করা হয়, কোর্ট অব ডিরেক্টরস ভারতের কম্পানীর সরকারকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ প্রেরণ করে। উক্ত নির্দেশে বলা

হয় : "প্রত্যেক বৎসরে অন্যূন এক লক্ষ টাকা, স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহদান ও ভারতবর্ষীয় বৃটিশ অধিকারের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইবে।"[৭] [শিবনাথ শাস্ত্রী-কৃত অনুবাদ] শিক্ষা খাতে এই অর্থ বরাদ্দের অপর একটি কারণও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তৎকালীন শিক্ষার বাস্তব অবস্থা প্রসঙ্গে গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো মন্তব্য করেন, 'ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের মধ্যে উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতি হইতেছে' এবং সুপারিশ করেন 'কাশীর কালেজ ব্যতীত, নবদ্বীপেও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাগুর নামক স্থানে আর দুইটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপন করা হউক'।[৭ক] লর্ড মিণ্টোর সুপারিশে লক্ষণীয় বিষয় এই যে তিনি এদেশীয় শিক্ষার সম্প্রসারণের কথাই বলেছেন, ইংরেজী শিক্ষার কথা নয়। যা হোক্‌, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কম্পানীর সরকার শিক্ষার জন্য উক্ত বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। সুতরাং এদেশীয়দের শিক্ষার ক্ষেত্রে কম্পানীর অনুসৃত ঔদাসীন্যপূর্ণ নীতির কোন পরিবর্তন বস্তুত ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কার্যকর হয় নি। এ-সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় করা যায়।

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারত ও চীন দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। ইতিমধ্যে ভারত ভূখণ্ডে ইংরেজ অধিকার বিস্তৃত ও সংহত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়ায় বৃটিশ বণিকেরা ভারতের এবং চীনের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার অধিকার লাভে আগ্রহী হয়। উপরন্তু বৃটেনের নতুন নতুন শিল্প সংগঠন এ সময় থেকেই ভারত-ভূখণ্ডকে বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজারে এবং শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রপ্তানীর ক্ষেত্রে পরিণত করতে উৎসাহী হয়। কিন্তু কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকার থাকায় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী ও কাঁচামাল আমদানীর জন্য বৃটিশ শিল্পপতি এবং বৃটিশ বণিককে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর উপর। অথচ এ-বিষয় কম্পানী-প্রবর্তিত ব্যবস্থাদি যথোপযুক্ত নয় বলেই বৃটিশ শিল্পপতি ও বণিকদের স্থির সিদ্ধান্ত। সে-কারণে কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকার অবলুপ্ত ক'রে সকল বৃটিশ

বণিকের কাছে ভারতের বন্দরগুলি উন্মুক্ত করার দাবী উক্ত সংগঠনগুলি বার বার করতে থাকে। তারা এই অভিমত প্রকাশ করে যে তাদের দাবী গৃহীত হলে অবশ্যই বৃটিশ শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানীর ক্ষেত্রে বৃটিশ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানর পরিমানই হবে সর্বাধিক। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানিকে সনদ পুনর্প্রদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক বৃটিশ বণিক ও বৃটিশ শিল্পপতি তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টারে চীন দেশ ব্যতীত ভারত ভূখণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী সহ অপরাপর বৃটিশ প্রজাকে যুক্তরাজ্যের নির্দিষ্ট কয়েকটি বন্দর এবং ভারতীয় বন্দরের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হল কম্পানীর স্বার্থরক্ষায় আরোপিত কয়েকটি বিধিনিষেধ ও সর্ত সাপেক্ষে।৮ সুতরাং কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার এবং বৃটিশ বণিকদের অবাধ বাণিজ্যাধিকার লাভের দ্বন্দ্বে শেষোক্ত নীতি আংশিক সাফল্য ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে প্রতিফলিত হলে, কিন্তু উক্ত অধিকারের চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য বৃহত্তর ও বিস্তৃততর আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দিল এবং এর সঙ্গে যুক্ত হল ভারতে ইয়োরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার লাভের আন্দোলন। এই দুই আন্দোলনের প্রভাব সম্প্রসারিত হয় কলকাতা-সমাজের দেশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও।

এ ভাবে ভারতের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির প্রশ্নে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ বিষয়ে, শিক্ষা-দীক্ষা প্রসঙ্গে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নানা বিরুদ্ধ শক্তি যখন পরস্পরের সম্মুখীন এবং পরস্পর চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিষয়কর্ম ত্যাগ করে তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার ও পরিরক্ষণের মানসে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনায় রামমোহন স্বোপার্জিত অর্থে ক্রীত ভূ-সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যথার্থ জমিদার। বর্তমানে বর্ধমান ও হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপ্ত ছিল তাঁর জমিদারী। এ-সময় শহর কলকাতায় তাঁর সম্পত্তির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। সুদের ব্যবসায়, কম্পানীর কাগজ-পত্রের ব্যবসায়, জন ডিগ্‌বীর দেওয়ান-পদের মাধ্যমে এবং কম্পানীর অধীনস্থ কর্মচারী

হিসাবে কর্মসম্পাদনের সূত্রে ইতিপূর্বে ইয়োরোপীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশেষত অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ইয়োরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, সে পরিচয় এ-সময় থেকে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

কলকাতায় রামমোহনের স্থায়ী বসবাস, সেকালে বিশেষ তাৎপর্যলাভ করেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ কর্মচারী ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে কলকাতায় এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামাজিক দিক থেকে অতীতাশ্রয়ী হলেও মনন ও কর্মকাণ্ডের দিক থেকে ইয়োরোপীয় চিন্তা ও ভাবাদর্শের দ্বারা আলোড়িত এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এ-শ্রেণীর অনেকেই কলকাতার গণ্যমান্য হিন্দু পরিবারভুক্ত, পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের প্রেরণায় অস্থির, চঞ্চল। এঁদের অনেকেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন দ্রুত পরিবর্তনশীল শাসন-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হিন্দুধর্মের রূপপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।[৯] এমনকি অনেকেই ধর্মের সঙ্কীর্ণ সীমার বাইরেও নানাবিধ বিষয়ে উৎসাহী। অথচ এঁরা সবাই ছিলেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কলকাতায় রামমোহনের আগমন এই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবাহিত চিন্তাধারাকে সংগঠিত করে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর গ্রহণ পর্বকে ত্বরান্বিত করে।

রামমোহনের কলকাতায় আগমনের পরের বৎসর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মীয়-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আত্মীয়-সভার প্রাণকেন্দ্র ছিলেন রামমোহন। স্বল্পকালের মধ্যেই এই সভার সঙ্গে যুক্ত হন কলকাতার প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অনেকেই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। সদস্য-দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন জমিদার পরিবারের, অনেকেই ছিলেন ইংরেজ শাসক, ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্নেহধন্য বিত্তশালী নতুন বণিক-কর্মচারীর পরিবারভুক্ত। আবার এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কোন নির্দিষ্ট সামাজিকস্তরভুক্ত নন। তাঁদের বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক চিন্তাজগতের অভিযাত্রী। গঠন ও কর্মসূচী উভয়দিক থেকেই অবশ্য এ সভা হিন্দু-সংগঠন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সরল, অনাড়ম্বর সাধারণ মানুষের বোধগম্য ঈশ্বর উপাসনা পদ্ধতি নিরূপণ এবং তার প্রভাব ছিল এই সভার সকল কর্ম প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। আচার-সর্বস্ব

ধর্মাচরণের বিধিনিষেধ থেকে ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে মুক্তিদান ছিল এই সভার অন্যতম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, আত্মীয়-সভার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে খ্রীষ্টধর্মাচরণের সঙ্গে পরিচিত রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সভা মূলত হিন্দুসংগঠন কিন্তু একটি বিশেষ সুনির্দিষ্ট ধর্ম-গোষ্ঠী নয়। সকল সম্প্রদায়ের এমনকি বিদেশাগত ব্যক্তিরাও এ সভার বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। সেদিক থেকে এ-সভা ছিল উদার ও প্রাগ্রসর চিন্তাধারায় পুষ্ট।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বস্তুত, এই গ্রন্থ সংস্কৃত বেদান্তের বাংলা অনুবাদ। বাংলা ও হিন্দী ভাষায় 'বেদান্ত-সার' (১৮১৫) গ্রন্থের প্রকাশও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতাবৎকাল বেদান্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের একক্তিয়ারভুক্ত ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি বেদান্তের যে ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রদান করতেন কলকাতা সমাজের দেশীয় সম্প্রদায় তাই অকাট্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করত। রামমোহন উক্ত অনুবাদ প্রকাশ করে প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের একচোটিয়া উত্তরাধিকারকে সর্বসাধারণের উত্তরাধিকারে পরিণত করেন। ফলে 'বেদান্ত সাধারণ মানুষের বোধগম্য শাস্ত্রে পর্যবসিত হল। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির কুক্ষিগত শাস্ত্রের এ-হেন মুক্তি স্বভাবতই চিরাচরিত আচার-আচরণ ও সংস্কারে আবদ্ধ কলকাতা সমাজের দেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বস্তুত কলকাতায় রামমোহনের স্থায়ীভাবে বসবাস, আত্মীয়-সভা গঠন ও বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা-সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সূত্রপাত করে এবং কালক্রমে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে এবং সমাজ জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। অবশ্য এই দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মাঝে কখনও কখনও মিলনের সুর ও ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে, আবার কখনও কখনও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পরস্পর স্থান পরিবর্তনেও দ্বিধা করে নি। ধর্ম, শিক্ষা, আইন, বিচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ভূমি, ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কম্পানী-অনুসৃত নীতি ও তার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক বৃটিশ শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী

ও কর্মতৎপরতা, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও তৎসংক্রান্ত সমস্যা, বৃটিশ প্রাচ্যবিদদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও কর্মতৎপরতা প্রমুখ বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাসমূহ তৎকালীন কলকাতা-সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণ ও অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে পারস্পরিক আঘাত এবং সংঘাতের সৃষ্টি করল। আর এই আঘাত ও সংঘাত উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেই যে এই দ্বন্দ্ব এবং মিলনের সূত্র নিহিত আছে তা বলাই বাহুল্য।

নির্দেশিকা

১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী পৃ ৭০ ৭০

২. The Rise and Fall of the East India Company, Ramkrishna Mukherjee pp. 316 318

৩. Ibid, op cit p 330

৪. Quoted by K K Dutta in Social History of Modern India p. 48

৪ক Ibid op cit p 5

৫ Cited by David Koff in British Orientalism pp 141-142

৬. Ramkrishna Mukherjee Op cit p, 421

৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, op cit, p 78

৭ক Ibid op cit. pp 77, 77

৮ Problems of Empire, P J Marshall p 232

৯. Rammohan Roy, Vol I, Iqblal Singh pp 121, 122

৯ক Ibid, op cit. p. 123

উত্তরসূরি

উত্তরসূরি ॥ ১০২ তম। মাঘ-চৈত্র ১৩৮৫ ॥ ২৬ বর্ষ ২য়

●

প্রবন্ধ

কবিতাবলী

সাহিত্য

নতুন কবিতা

চিঠিপত্র

● ·

সম্পাদক · অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরি কার্যালয় . ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড কলকাতা ৭০০০৫০

কবিতার ভাবনা (৮)

অরুণ ভট্টাচার্য

একটি বই আচমকা হাতে এলো। সমর সেন মহাশয়ের 'বাবুবৃত্তান্ত'। প্রকাশ করেছেন আশা প্রকাশনীর শীলা ভট্টাচার্য। যে কোন রুচিবান শিক্ষিত বাঙ্গালী সমর সেনের বই হাতে পেলে খুশি হবেন। এর একাধিক কারণ। সমর সেন বিশিষ্ট কবি, রুচিবান শিক্ষিত বাঙ্গালী—যিনি ইংরেজী ভাষা দুরন্ত-ভাবে জানলেও এবং বিদেশ পাড়ি দিলেও একটা আন্তর্জাতিক চৈতন্যকে বাঙ্গালীয়ানা দিয়েই ধরে রাখতে পেরেছেন। এবং যাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য নিশ্চয়ই ফেলনা নয়। তিনি রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের নাতি। এসব কারণে 'বাবুবৃত্তান্ত' বইটি যদি শিক্ষিত রুচিবান বাঙ্গালীর হাতে হাতে ঘোরে তবে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত হবে না।

আমার কাছে বইটির এবং লেখকটির প্রতি আকর্ষণের অন্যবিধ কারণ আছে। সমর সেনের মত আমিও কবিতা অল্পস্বল্প লিখে থাকি। সমর সেনের মত আমারও বাল্যজীবন বাগবাজারে কেটেছে—এবং পাশাপাশিই কেটেছে। বলা বাহুল্য, সেসময় বয়সের পার্থক্য থাকলেও, আমরা উভয়েই কিশোর। এবং একই রাস্তায় ঘোরাফেরা করেছি। ৭নং বাড়িতে রায়বাহাদুর থাকতেন—বিশ্বকোষ লেনে। আমরা ছিলাম ৯ নম্বরে। মধ্যিখানের বাড়িতে ৮ নম্বরে থাকতেন নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, যিনি 'বিশ্বকোষ' সম্পাদনা করতেন। বস্তুত আমাদের ৯ নম্বর বাড়ির একতলা এবং দোতলা অংশত বিশ্বকোষের ছাপাখানা

ছিল—যে কারণে বালক বয়সেই আমরা লেড, টাইপ, ফর্মা, মেক্‌-আপ ইত্যাদি শব্দগুলো শুনতে অভ্যস্ত ছিলুম। তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছি দু'চারখানা বই লিখবো, পত্রিকা বার করবো এবং এই লেড, টাইপ, ফর্মা-বিভূষিত প্রেসের সঙ্গে আজীবন গাঁটছড়া বাঁধবো। এবং সমর সেন মহাশয়ের মতই আমিও পড়তুম মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে। পরবর্তীকালে সমর সেন এবং আমি দুজনেই 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য। সুতরাং এতগুলি আত্মীয়তাবন্ধনস্বরূপ সমর সেনের আত্মজীবনীমূলক রচনার প্রতি আমার আকর্ষণ অন্যের চেয়ে যদি বেশী হয় তবে নিশ্চয়ই তা অন্যায় নয়। সুতরাং বইটি হাতে পাওয়া মাত্র পড়ে ফেললুম।

এবং সেই বৃত্তান্তের বহু কিছুই বালককালকে নিয়ে লেখা—যা বিশ্বকোষ লেনের আশপাশের অঞ্চল এবং আমার বালক-কৈশোর-যৌবনের সময়কাল। যত বয়স বাড়ছে আমার শৈশবে ফিরে যাবার আকর্ষণ বাড়ছে। এ বিষয়ে আমার একটি কাব্যগ্রন্থের নামই [সমর্পিত শৈশবে] সেকথা প্রমাণ করবে। বাগবাজার অঞ্চলটি এমন যাকে ঠিক অবহেলায় পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না, হয় তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতে হয়, না হয় ঘৃণায় নাক সিঁটকোতে হয়। সমর সেনের রচনার মধ্য দিয়ে অবশ্য একটি নৈর্ব্যক্তিক ছবি পাওয়া গেছে। আমি বাগবাজারকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। এখনও বাগবাজার অঞ্চলে গেলে এবং সময় হাতে থাকলেই গঙ্গার ধারে বিচালী ঘাটে যাই, অস্তসূর্যের খানিকটা দেখি, স্রোতস্বিনীর মাঝখানে শান্ত আভার বিচ্ছুরণ দেখতে পাই, পত্রিকা অফিসের সেই সরু গলিটা পথে পড়ে (সি এম ডি. এ কে ধন্যবাদ, গলিটায় তারা এখনো হাত দেন নি)—যার মধ্য দিয়ে তিন মিনিটে আমাদের বাড়ি থেকে তারাশঙ্কর বা যামিনী রায়ের বাড়ি এক দৌড়ে যাওয়া যেত। সনৎ, অর্থাৎ তারাশঙ্করের বড় ছেলে, আমাদের থেকে তিন চার বছরের বড় ছিলেন—বালককালে সে তফাৎটা খুব বেশী নয়। এইতো সেদিন সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। এখন তাঁর কথা বড় মনে পড়ে। যামিনী রায়ের দুই ছেলেই—তাঁরা এখন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছেন—পটল, বোতল, ডাকনামে নিশ্চয়ই ছোটবেলার বন্ধুরা রাগ করবেন না। আমাদের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত। আর কাশিমবাজারের ডানপিটে ছেলে ছিল অনিল—বর্তমানে দুর্ধর্ষ রিপোর্টার, যুগান্তরের অনিল

ভট্টাচার্য। সেকালেই অনিল থিস্তিখেউরে টেক্কা দিয়েছিল। দেশবন্ধু পার্কের মাঠে বা গঙ্গার ধাবে বসে গোল হয়ে অনিলের ভাষা শুনে আমাদেব কান প্রায়শই বক্তিম হত। অনিল অভ্যেসটি যত্ন কবে ধবে রেখেছে। চুয়ান্ন বছবে পা দিযেও তাঁর ভাষা বিশেষ অদলবদল হয় নি। পাঠকদের বিশ্বাস না হলে যে কোন দিন 'যুগান্তর' অফিসে গিযে রাত্রিবেলা অনিলেব কাছে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে নিতে পাবেন। অম্লানবদনে খিস্তি-খেউড যাঁবা কবতে পারেন তাঁরা মানুষ হিসেবে দিলখোলা এবং খোসমেজাজী হন, এটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

বস্তুত এই তো ছোটবেলার বঙিন কাহিনী—যেজন্য সমব সেন মহাশয়ের বইটি পডেই আমি প্রায় দীর্ঘদিন আচ্ছন্ন ছিলুম। তরুণকান্তি, মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী, আমাদের এক ক্লাশ উঁচুতে পডতেন। দুপুরবেলা টিফিনের সময় তাঁর বাডি থেকে ভাবী টিফিন যেতো। আমরা জুলজুল কবে তাকিয়ে থাকতাম। এবং বিকেল হলেই ধর্মদাস এবং দক্ষিণার মারামাবি হতো, একটা daily event যাকে বলে। ক্লাসের ছেলেরা সবাই টিফিনেব সময থেকেই প্রত্যাশা কবে থাকতো। কখন মারামাবির কথাটা পাকা হবে। দক্ষিণা আব বেঁচে নেই। হেডপণ্ডিত মশাই ক্লাসে এসে পানটি মুখে দিযেই এক চুমুক ঘুমিযে নিতেন। পা টিপে টিপে হেডমাস্টার ললিত ভট্টাচার্য মহাশয় ঘুবে যেতেন এবং পণ্ডিত মশাইয়ের আলতো ঘুম ভেঙ্গে যেতো—সঙ্গে সঙ্গে বলতেন.. 'হ্যাঁ যা ভাবছিলুম, মনে পড়েছে, ষত্ববিধান এবং ণত্ববিধান বিষয়ক নিয়মাবলী ইত্যাদি' । মুখ টিপে আমরা সবাই হাসতুম, বলাই বাহুল্য। হেডমাস্টার মশাই-এর গম্ভীব মুখেও বোধহয় একটু হাসির রেখা দেখ যেত।

পাঠক জিজ্ঞেস করতে পারেন, এই সব ঘটনাবলীর সঙ্গে কবিতাব ভাবনা বিষয়ক সম্পর্ক কোথায। সেই প্রসঙ্গেই এবার আসা যেতে পাবে। এই সব ঘটনাবলী একজন কবিকে সোজাসুজি সৃষ্টিব জগতে নিয়ে যায়। প্রগাঢ বন্ধুত্বেব স্মৃতি কত উদ্বেল হয়ে ধবা দেয় কবিচিত্তে, বর্ষার গঙ্গা এখনো কাছে ডাকে। একদা এমন কয়েকটি পংক্তি লিখেছিলুম, প্রথম যৌবনে কাঁচা হাতে

> মেঘের বৈকালী কি বিচিত্র রামধনু রঙে
> অপরাহ্ন শিশিরের পল্লবের, ওপারে গঙ্গার ..... ইত্যাদি

আবার

এখনো এখানে এই ক'লকাতার সন্ধ্যার আকাশে
মেঘেরা বেড়ায়।
এখনো বৃষ্টির শব্দে সকালেই ঘুম ভাঙ্গে। (ঋতুবঙ্গ' সায়াহ্ন)

তিরিশ বছর আগেকার লেখা একটি কবিতার ইতস্তত পংক্তিগুলির উৎস কিন্তু বাগবাজারের গঙ্গার ঘাট অথবা বিবেকবেলা দেশবন্ধু পার্কের পুকুরপাড়ে বন্ধুবান্ধবের জমাট আড্ডায়। অথবা একটু বড় হয়ে একদিন আমরা চার বন্ধু সারদা[১], বিমল, অশোক এবং আমি শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে বিদ্যুতের 'মেরী কেটারারস্' চায়ের আড্ডা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শান্তি ঘোষ স্ট্রীটে গলির মুখে দাঁড়িয়েছিলুম। বাড়ি ফিরেও সেই সামান্য ঘটনাটি মন থেকে যায় নি—কেননা সেদিনের এই একত্র থাকার ঘটনাটি বিশ্বের অন্য সব ঘটনা থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে দেখা দিয়েছিল। সেদিনের সেই কথাগুলি হয়তো প্রকাশ্যে বলার নয়, কিন্তু সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কবিতাটি একদা লিখেছিলুম সেটি প্রকাশ্যে, জনতার হাতে দেওয়া যায় :

আমরা চিরকাল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।
লোকজন ব্যস্ততা ভিড়। যুবকেরা সব
যে যার মতন চলে যাচ্ছে দূর দেশে।
অন্যমনস্ক গলিটির মোড়ে আমরা চারজন শুধু,
দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

অন্যমনস্ক গলির মোড়ে। চারটি বন্ধু চারদিকে
যাব বলে ঠায় দাঁড়িয়ে, প্রখর মধ্যাহ্ন।
হাওয়ায় আগুনের আসঙ্গ, কৃষ্ণচূড়ার বাসর।
যৌবন নয়, অন্য এক নামে ভাবছি দরজার ওপারে যাব।
এপারে তৃষ্ণা প্রেম স্মৃতি নৈঃশব্দ।

(দরজার ওপারে ' সমর্পিত শৈশবে)

এই চারবন্ধু কিন্তু, আমরা না হয়ে, অন্য যে কোন চারবন্ধু হতে পারতো, অন্য যে কোন দেশের যে কোন কালের। কেননা, সেই প্রখর মধ্যাহ্নে হাওয়ায়

আগুনের আসঙ্গ এমনি যে কোন চারজন যুবক অনুভব করতে পারতেন— তারাও দরজার ওপারে যাবার কথা ভাবতে পারতেন, কারণ, এপারে শুধু তৃষ্ণা প্রেম স্মৃতি ইত্যাদি। সুতরাং কবিতাটির রচয়িতা আমি হলেও এর অধিকার এখন সকলের।

এমনিভাবেই হয়তো কবিতা আসে—শিল্প সৃষ্টি হয়ে ওঠে। ছোটবেলায় বিস্ময় বা যৌবনের অভিসার, অভিজ্ঞ বয়সীর চেয়ে কম জরুরি নয় কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে। কলেজের গণ্ডী পার হয়ে যখন সংবাদপত্রে কাজ করতুম তখন একদিনের কথা মনে পড়ে। নাইট ডিউটি ছিল, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া সেরে সাড়ে ন'টা নাগাদ কাগজের অফিসে গিয়েছি। দুটো আড়াইটে অবধি রাত্রিতে কাজ করতে হোত, টেলিপ্রিন্টারের টক্‌টক্, ঝক্‌ঝক্ শব্দ কানকে অসাড় করে দিত—নতুন নতুন সংবাদের উত্তেজনায় বেশীর ভাগ দিনই সময়ের হিসেব থাকতো না। কাজের শেষে কোনও দিন অঘোর ঘুম আসতো, কোনও দিন আসতো না। এমনি এক ঘুম-না-আসা রাত্রিতে একটি কবিতাগ্রন্থ পড়ছিলাম, সঙ্গে ছিল। বন্ধু জগন্নাথ চক্রবর্তীর।[৩] খুলেই একটি কবিতা পেলাম। নাম 'টেলিপ্রিন্টার'। কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিরক্তিকর টেলিপ্রিন্টারের ঝক্‌ঝক্ শব্দের অতিরিক্ত যে আশ্চর্য রহস্যলোক আছে তা জগন্নাথের কবিতার মধ্য দিয়ে কী সাংঘাতিকভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল আজো মনে পড়ে। হয়তো তখন আমাদের জগৎই ছিল সংবাদপত্রের—আর সেই জগৎকে কত অনায়াসে ধরতে পেরেছিলেন সেদিনের তরুণ কবি। বইটি হাতের কাছে নেই। থাকলে কিছু উদ্ধৃতি অবশ্যই দেওয়া যেতো—এবং সেই সঙ্গে আর একটি আশ্চর্য মানবিক কবিতা, 'জটি বুড়ীর নববর্ষ'। অবশ্য সব মহৎ কবিতাই মূলত মানবিক, তথাপি যে অর্থে এই কবিতা মানবিক সে অর্থে 'টেলিপ্রিন্টার' নয়, যদিও দুটি কবিতাই আমার কাছে এখনো স্মরণীয়। প্রথম কবিতাটি জগন্নাথের কর্মজীবন থেকে প্রত্যক্ষ সঞ্জাত, দ্বিতীয়টি তার ভাবজগতের সৃষ্টি—সেখানে মানবিক করুণাই কাব্যের উৎসমূলে। সুতরাং কবির কাছে জগৎসংসারের সব কিছুই কাব্যের মালমশলা হয়ে এক নতুন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে শিল্প আখ্যা পায়। শৈশব কৈশোর যৌবনের স্মৃতিগন্ধবহ বেদনা বা আনন্দ এক পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে কবির কাছে ধরা দেয় নবতর ব্যঞ্জনায়।

এমনি কিছু কবিতা পড়ছিলাম ক'দিন আগে। শ্যামবাজার-মুখী ট্রামের জানালার ধারের সীটে আচমকা বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল মৃগাঙ্কর নতুন কবিতার বই—এতো নতুন, মলাটের কাগজের গন্ধ এত টাটকা যে মনে হ'ল প্রেস থেকে সদ্য এলো ছাপা হয়ে। সেদিনই বিকেলে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার অফিসে মৃগাঙ্কর সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার উপরি পাওনা হ'ল মৃগাঙ্কর 'তাসের পেখম' কবিতার বইটি। সেই 'সমুদ্রকন্যা'—মৃগাঙ্ক রায়ের যৌবনের কাব্যগ্রন্থ। আর পঞ্চাশ বছর বয়সে 'তাসের পেখম'। অর্থাৎ পুরো যৌবন পেরিয়ে, প্রৌঢ়ত্ব পেরুবার শেষ মুখে আবার একটি কবিতার বই বেরুলো। আমার ধারণা, এর জন্য মৃগাঙ্কর আলস্যই দায়ী। মৃগাঙ্কর ধারণা, ওর চাকুরীই দায়ী। সকাল ন'টায় বেরিয়ে রাত্রি ন'টায় বেহালা ফিরে কারো আর কলম ধরবার ইচ্ছে হয় না—এবং তাও, রাত্রি ১০ টার পর, নিয়মিত অন্ধকারে। মৃগাঙ্ক বলছিল, কবিতার বইটির জন্য ভবতোষের[২] উৎসাহই দায়ী। আমিও সেকথা মনে করি, বইটি ভবতোষকেই উৎসর্গ-করা। একজন রুচিবান সাহিত্যরসিক ব্যক্তিকে কবিতার জগতে পুরোপুরি টেনে আনতে পারলে কবিদেরই লাভ। সে অর্থে ভবতোষ যতো কবিতার জগতে প্রবেশ করবেন আমাদেরই সুবিধে। শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায় বা অমলেন্দু বসুর কবিতাপ্রীতি বাংলাদেশে প্রবাদবাক্য। প্রায় প্রত্যেক তরুণ বা তরুণতর কবি এঁদের দুজনের কাছে ঋণী। এখনো মনে পড়ে "চল্লিশ দশকের কবিতা" সংকলন গ্রন্থখানি হাতে হাতে নেবার জন্য নীহারবাবু কফি হাউসে ছুটে চলে এলেন এবং আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ সুভাষ, বীরেন, অরুণ সরকার, নীরেন, মঙ্গলাচরণ[৩] প্রমুখ কবিদের সঙ্গে প্রায় আড়াই ঘণ্টা আড্ডা দিলেন, উঠ্‌তি কবিদের মতোই, প্রচণ্ড উৎসাহে। আর একদিন ওই কফি হাউসেই অমিয় চক্রবর্তী প্রায় ঘণ্টা তিনেক আড্ডা দিয়েছিলেন প্রেমেনদা বিষ্ণু দে অমলেন্দু বসু ইত্যাদির সঙ্গে। আমরা অর্থাৎ বীরেন কিরণশঙ্কর এবং আমি ছিলুম সঙ্গে। প্রেমেনদার প্রচণ্ড উৎসাহে চৌরঙ্গীর একটি দোকান থেকে আমরা সাতজন ফটো তুললুম। ফটোটা হয়তো কোনদিন ইতিহাসের মর্যাদা পাবে। বিষ্ণু দে-কে এতো সুন্দর দেখাচ্ছিল (যা এখনো দেখায়) যে জামাইবাবু বলে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়, ওঁর অমলিন ফটোটায়, পঞ্চান্ন বছর বয়সেও। আমাদের তো রীতিমত ঈর্ষা হয়।

উলটোপালটা কথা এসে গেল। মৃগাঙ্কর কবিতায় আসি। একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিই :

এক একটা গল্প
বড় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, বড়
সন্তর্পণে পা ফেলে
এগোয়। হয়তো কিছুই ঘটে না, অথচ
গল্প ক্রমশ এগোয়।
ঘুরন্ত চাকার ওপর বারো রঙের বারোটা পাখি
ঘোরে, ছয় কুমার চাকা ঘোরায়। ধীরে—
খুব ধীরে ধীরে—ঘটনার ভেতর দুর্ঘটনা
গড়ে ওঠে, গল্প
এগোয়, কখনো পেছিয়ে যায়, ফের
এগোয়, দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফায়।

মধ্যিখানে আরো তিনটি স্তবক আছে। আমি সেগুলি বাদ দিয়ে শেষ স্তবকে চলে যাই

গল্প শেষ হয় না।
সেই গল্পের ঘরে একদিন
অন্য মানুষ এসে
গুছিয়ে সংসার পাতে। আর
সাদা দেয়ালের গায়
মালা জড়ান একটা মুখোশ
গাজনের গাছে
পিঠ-ফোঁড়া সন্ন্যাসীর মত
উপুর হয়ে ঝুলে থাকে।

এই সমস্ত কবিতাটির অনুষঙ্গ, ছবি—ছবি-থেকে-উঠে আসা অনুভূতিমালা সবই কৈশোর কালের, আমার তো মনে হয়েছে। গাজনের সন্ন্যাসীর চিত্রটি বালককালেই 'হন্ট' করে—এই বয়সে নয়। ঘুরন্ত চাকার ওপরে বারোটা পাখির দৃশ্য হয়তো এখনো দেখি কিন্তু সে-দেখায় পঞ্চাশ পেরিয়ে সেই বিস্ময়

থাকে না যা বালকবয়সের অনুভূতিতে অমলিন হয়ে আছে। এই সব স্মৃতি-কথা থেকে কবিতা জন্মায় কারো কারো ক্ষেত্রে। আমার কবিতার মালমশলা প্রায় সবই সেকালের, এখন আমি পুরনো স্মৃতি হাতড়ে লিখি। মৃগাঙ্কও তাই লিখছেন। তার মানে এই নয় যে পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা কবিতায় রূপান্তরিত হবে না। নিশ্চয়ই হবে, আর তাই প্রৌঢ়ত্বের বিষাদ, পেছনে-ফেলে-আসা যৌবনের দিনগুলির জন্য হাহাকার এই বয়সেই কবিকে নাড়া দেয় প্রবলভাবে। এসময় জীবন জগৎ থেকে অভিজ্ঞতার সারাংশটুকু ধরা দেয় কবির কলমে :

> অথচ পালালেই কেউ পালাতে পারে না
> শুধুই নাচের মুখোশ পাল্টায়।

অথবা সত্যি, মৃগাঙ্ক যেমন চাকুরি নিয়ে ব্যস্ত—সেই ব্যস্ততাই ওঁকে কিন্তু একটি সার্থক কবিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মৃগাঙ্ক বলছেন

> এখন আমরা খুবই ব্যস্ত এবং একা। আমরা কেউ-ই আর বেশিদিন বাঁচবো না, বেশিদিন আর ভোরের শীতল মাটিতে হাঁটব না, আকাশ দেখব না, মাঠ দেখব না, মেঘের ফাটলে আলোর উৎসার দেখব না। অথচ আমরা তার জন্যে এখনো প্রস্তুত হই নি।

শেষ পংক্তিটি অসাধারণ। 'readiness is all' এই ধারণাটা বড় মারাত্মক—সেই 'readiness' আমাদের নেই, অথবা নানা কারণে আমরা তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারি নি—দেখতে দেখতে জীবন কেটে যাচ্ছে। 'দিন যায় রে দিন যায়', হঠাৎ এক সন্ধেবেলা পশ্চিম আকাশের গোধূলির আলো একথা মনে করিয়ে দেবে 'আমরা এখনো প্রস্তুত হই নি'।

আমি একটু গানবাজনা ভালোবাসি—শুনতে এবং এজাতীয় বই পড়তে। হ্বাগনার সাহেবের আত্মজীবনীতে কয়েকটি কথা ভারী সুন্দর আছে। উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারলুম না। যে কোন কবির কাছে বা সৃষ্টিশীল লেখকের কাছে প্রত্যেকটি শব্দ অত্যন্ত জরুরি। হ্বাগনার তাঁর কম্পোজিশন-এর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সূত্র হিসেবে এই কটি কথা বলেছেন :

> My whole imagination thrilled with images ; long lost forms for which I had sought so eagerly shaped themselves ever more and more clearly into realities that lived again. There rose up soon before my mind a whole world of figures which revealed themselves as so strangely plastic and primitive, that when I saw them clearly before me and heard their voices in my heart, I could not account for the almost tangible familiarity and assurance in their demeanor

বিশ্বের একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর এমত অনুভূতি কবিদেব অনুভূতিরই প্রতিরূপ মনে হয়। বিশেষ করে 'primitive' কথাটি সাংঘাতিক। 'primitive' কথাটিতে এখানে যে ব্যাপ্তি আছে তা পাঠককে অবশ্য মনে রাখতে হবে।

২.

কিন্তু বাগবাজারের স্মৃতি থেকে বহুদূর চলে এসেছি। সমর সেন মহাশয় বাগবাজারের স্মৃতিকথায় মাত্র যামিনী রায়ের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যামিনী রায় ব্যতীত বাগবাজারে তখন আরো কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। আমরা ছোটবেলায় তাঁদের আশেপাশে চলাফেরা করেছি, বড় হয়ে যখন সাহিত্যজীবনে প্রবেশ করেছি তাঁদের সঙ্গে সাহস করে আলাপ পরিচয় করেছি। তারাশঙ্করের কথা আগেই বলেছি। তাঁর বাড়িটি ছিল একেবারেই যামিনী বাবুর পাশের বাড়ি। পত্রিকা অফিস অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকার বিরাট বাড়িটি হল এই দুই বাড়ির নিশানা। অনেক সাহেবসুবো তখন যামিনী বাবুর বাড়ি ছবি দেখতে আসতেন। যামিনীবাবু মাঝেমধ্যে নিজের বাড়িতেই ছবির প্রদর্শনী করতেন মনে আছে। একবার আমার এক আত্মীয়, ছবির ভক্ত, আমাদের বাড়ি এসেছিলেন যামিনীবাবুর প্রদর্শনী হচ্ছে শুনে আমাকে বললেন, নিয়ে চলো তো। পটল বোতলদের বাড়ি নিয়ে যাবো, এর আর কথা কি। এক মুহূর্তে রাজী হলাম, গায়ে গেঞ্জী ছিল মাত্র, তখন হাফপ্যান্ট পরার বয়স, মাঝেমধ্যে কাপড় পড়া ধরেছি। কাপড়টা কেত্তা দিয়ে পরেই চলে গেলুম। আত্মীয়টিকে নিয়ে বেশ

সগৌরবে প্রদর্শনীতে ঢুকেছি। কিছুক্ষণ পরেই যামিনীবাবু সেঘরে ঢুকলেন। একটু কি যেন ভাবলেন মনে হল, আমার কাছে এসে বললেন, আমার সঙ্গে এসো তো। আমি তাঁর সঙ্গে পাশের ঘরে গেলুম। বললেন, এই পোষাকে ছবি দেখতে আসো? আচমকা থতমত খেয়ে গেলুম। পরে বললেন, যাও, ওঘরে গিয়ে কাপড়টা অন্তত ঠিক করে পড়ে এসো। সেদিনের লজ্জা এবং গ্লানি এখনো ভুলতে পারি নি। কিন্তু যামিনীবাবুর সস্নেহ শিক্ষা আমাকে একটি ভদ্র রুচিকর পরিবেশের সন্ধান দিয়েছিল—যা তাঁর ছবির মতই রুচি এবং সহজ সরল বিবেকের প্রতিরূপ মনে হয়। পরবর্তীকালে আর কখনো এমন বকুনি খেতে হয় নি।

বাগবাজার স্ট্রীট যেখানে কর্ণওয়ালিশ্ স্ট্রীটে পড়েছে তারই কাছে দুটি পরপর বাড়িতে থাকতেন অশোক শাস্ত্রী মহাশয় এবং মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে জ্যোতির্ময় আমাদের সহপাঠী ছিলো। তারই জন্য ওই বাড়িতে আমাদের সহজ যাতায়াত ছিল—এবং যখন তখন। স্কুল কলেজের বন্ধুবান্ধবদের একটি নিয়মিত আড্ডার জায়গা ছিল। অশোক শাস্ত্রী মহাশয় মনিবাবুদের বাড়ির পশ্চিমের দোতলা বাড়িতে থাকতেন এবং অনেক সময়ই মনিলাল বাবুর বাড়িতে আসতেন। প্রথম কলেজ জীবনে আমি যেসব সাহিত্যিকদের সঙ্গে দূরে কাছে মেশবার সুযোগ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে মনিলাল-বাবুই ছিলেন আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সেই বাড়িতেই 'উত্তরা'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং আজীবন হৃদ্যতা। অমল হোম মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, বড়দা কুসুম ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। অমল হোম তখন ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের নামী সম্পাদক। (অমন রবীন্দ্র-সংখ্যা কি আর বেরুবে কোনদিন!) শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর একটু দক্ষিণ দিকে ছোট্ট একটি গলি সার্কুলার রোড অবধি গিয়েছে। সেই গলিতে অমল হোম থাকতেন। প্রতি রবিবার সকালে তাঁর বাড়িতে বেশ কিছু লেখক আসতেন। বড়দাও প্রায়ই যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে আমি। পরবর্তীকালে অমল হোমের অনেক স্নেহ লাভ করেছি। দেশবন্ধু পার্কের বাস ছেড়ে দিল্লী যাবার আগে আমাকে একটি মূল্যবান ফোটোগ্রাফ উপহার দিয়েছিলেন কবি টি. এস এলিয়টের। সেটি এখনো স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি।

মনিলালবাবু মধ্যিখানে কিছুদিন একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার

নিয়েছিলেন, অফিসটি ছিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ওপর, স্কটিশচার্চ কলেজের একটু উত্তরে। সেখানে নিয়মিত যেতুম। বাগবাজার থেকে আড্ডা দেবার জন্য আমরা কয় বন্ধু মাঝে মধ্যেই পত্রিকা অফিসটিতে ধাওয়া করতুম। বিমল যেত। বিমলের প্রথম জীবনের একটি গল্প, যতদূর মনে আছে, ঐ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল। অশোক শাস্ত্রী মহাশয় কলেজ থেকে প্রায় নিয়মিত হেঁটে আসতেন। মনিলাল বাবুর দপ্তরে খানিকটা বসতেন, গল্পগুজব করে আবার হাঁটা ধরতেন বাগবাজারের বাড়ির দিকে। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী সেসময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি (খারাপ অর্থে নয়) কেমন ছিল বোঝাতে গিয়ে একবার একটি কথা বলেছিলেন—আজও মনে পড়ে। চক্রবর্তী মহাশয়ের মাথার মধ্যিখানে, বলেছিলেন অশোক শাস্ত্রী, একটি পেরেককে পুঁতে দিলে সেটি স্ক্রু হয়ে বেড়িয়ে আসবে। নেহাৎই মজা করে বলা, এরকম 'innocent humour' শাস্ত্রী মহাশয় নিয়মিতই করতেন, অনায়াসে তাঁর কথাবার্তায় এগুলি চলে আসতো।

প্রখ্যাত গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় থাকতেন বাগবাজারেই। পরবর্তীকালে যখন তিনি টালা পার্কে ছিলেন, খুবই পরিচয় হয়েছিল। তারাশঙ্কর শৈলজানন্দ দু'জনেই তখন অতি জনপ্রিয় লেখক। বিশেষ করে দুজনার বহু বই সিনেমা থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার জন্য ঘরে ঘরে তাঁদের পরিচিতি। বাগবাজার থেকে এই দুই বন্ধু আবার টালা পার্কেই কাছাকাছি বাড়ি করেছিলেন। শৈলজানন্দের বাড়িতেই একসময় নীরেন থাকতেন, সেই সূত্রে পরবর্তীকালেও ঐ বাড়িতে শৈলজানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আমরা একবার একসঙ্গে কোচবিহার সাহিত্যসভায় যাই। প্লেনে ওঠবার আগে উনি আমাকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়েছিলেন, বললেন 'যদি মাথা ঘোরে এইটেতে কাজ দেবে, খেয়ে নাও'। ভীষণ হোমিওপ্যাথির ভক্ত ছিলেন। সাহিত্যিকরা বেশী বয়সে হোমিওপ্যাথিতে নিমগ্ন হন, রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রায় সবাই দেখছি। বাগবাজারে আরো দু'জন নাট্যকার সেসময় থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় নি, কিন্তু দূরে কাছে তাঁদের দেখতুম, মনে শ্লাঘার উদয় হতো—এতগুলি বিশিষ্ট সাহিত্যিক সংস্কৃতিবান লোক আমাদের পাড়ার অধিবাসী। এঁরা ছিলেন শচীন সেনগুপ্ত এবং বিধায়ক

ভট্টাচার্য। তখন বিধায়ক বাবুর নাটক 'বিশ বছর আগে' প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—যেমন করেছিল মনিলাল বাবুর নাটক 'বাঙ্গীরাও' এবং সিনেমা কাহিনী স্বয়ংসিদ্ধা'। বাগবাজারে যে বাড়িতে আমরা থাকতুম তাঁব খুব কাছেই থাকতেন জহর গাঙ্গুলি মশাই—সেকালের অতি জনপ্রিয় অভিনেতা। প্রতিদিনই সকালে বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ির রোয়াকে বসে খবরের কাগজ পড়তেন, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল চর্চা-চলত ফুটবল মরশুমে। সন্ধে হ'লেই ফুলবাবুটি সেজে গিলে-করা পাঞ্জাবী পবে স্টুডিও পাডায় চলে যেতেন ট্যাক্সি করে। বৃন্দাবন পাল লেনের দক্ষিণে কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট। আরো ছোটবেলায় আমবা সেখানে কিছুদিন ছিলাম। সেই বাড়ির পাশেই থাকতেন আশ্চযময়ী দাসী—যাঁর পুরনো রেকর্ডে এখনো প্রাচীন বাংলা গান শ্যামা সংগীত দু'চারখানা পাওয়া যেতে পারে। বামুন বাড়ীর ছেলে বলে সাংঘাতিক খাতির করতেন আমাদের। পুজোব কলাটা, বাতাসাটা, সন্দেশটা বেশীব ভাগ আমার কপালেই জুটতো। সকাল ৯টা থেকে ১২টা আশ্চর্যময়ীব রেওয়াজ শুনতাম নিয়মিত, তখনও আমরা স্কুলে ভর্তি হই নি। কিন্তু এটুকু মনে আছে, তাঁর সাধনা, নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের কোন তুলনা ছিল না। সন্ধেবেলা যদি থিয়েটারে না যেতেন আবার গানে বসতেন। দেবদ্বিজে প্রচণ্ড ভক্তি ছিল। আমরা সে বাড়ি ছেড়ে দেবার পরও ওঁর বাড়িতে গিয়েছি। তারপব কবে যে ওঁরা হারিয়ে গেলেন আমাদের জীবন থেকে সেকথা স্মরণ করলে এখন একটা অবিচ্ছিন্ন বেদনায় কোথায় যেন টান ধরে।

৩

'পরবাসী' কথাটা আমার খুব প্রিয়—যদিও আমি নিজের কবিতায় শব্দটি বেশী ব্যবহার করি নি, কিন্তু কেউ করলে আমার মনকে তা ভয়ানক নাড়া দেয়। চিত্ত ঘোষের নতুন কবিতার বই 'পরবাসী ঘুরে ঘুরে' হাতে নিয়ে এই শব্দকে কেন্দ্র করেই অনেকক্ষণ ভাবলুম। আমার নিজের এরকম ধারণা: শৈশব বালকবয়স এবং কৈশোরকাল একটি যুবককে তৈরী করে। সেই যুবকটি সারা জীবন ধরে জীবনেরই ভার বহন করে। এই ভারবহন তার অভিজ্ঞতাকে পরিসীমিত করে। কিন্তু অভিজ্ঞতা পেরিয়েও জগৎ জীবন সম্পর্কে যে বিস্ময়স্বরূপ

ধারণা তা' কিন্তু গড়ে ওঠে শৈশব-বালক-কিশোর বয়সকালে। সেই সময়ই মানুষের নিজস্ব ঘরে থাকা—তার বিস্ময়-ভরা চোখ দুটি দিয়ে জগৎসংসারের সব কিছুকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা। সেই দেখাই অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে নানাভাবে। বাকী জীবনটা সে পরবাসীর মত কাটায়। চিত্ত ঘোষের কবিতার মূল ভাবটির সঙ্গে আমার এই ভাবনাটি মেলে নি—কিন্তু তাতে কি আসে যায়। একজন কবি তাঁর নিজের স্বধর্মেই আস্থা রেখে নিজের মত ভাববেন। কিন্তু এই যে একটিমাত্র শব্দ 'পরবাসী'—ওখানেই আমাদের দু'জনার একটি ভয়ঙ্কর মিল রয়েছে। দেখা যাচ্ছে এখানেও কবি সেই কিশোরকালের স্মৃতি ধরে রাখতে চাইছেন—সেই 'যমনার মাঠ' 'সাদা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত শীতল রাত্রির প্রান্তর' —সেই সব কথা 'কী করে ভুলব'—কবির প্রচণ্ড অভিঘাত। পুরো বইটির মূল সুর ক'টি পংক্তিকে বিধৃত কি?

যে যার আপন ঘরে ফিরে যেতে চায়
ফিরে যেতে চায় গৃহ পল্লবের কাছে
পরবাসী, ঘুরে ঘুরে ভাসানো নৌকোয়
ভোরের গলুই বাঁধে তীরবর্তী গাছে। (যে যার আপন ঘরে)

তুলনা হিসেবে নয়, কেমন-যেন কাছাকাছি আমার কবিতার কয়েকটি পংক্তি—যদিও অনুষঙ্গ এবং আবেগ পৃথক, এখানে তুলে ধরি—

বালকটি উঠতে চাচ্ছে পাহাড়চূড়ায়।
পাহাড়চূড়ায় সব স্বপ্নগুলি অক্ষত থাকবে বলে
হয়ত পারবে সে তার শৈশবকে ধরে রাখতে দু'চার সেকেণ্ড।
নিম্নে এই ভয়াবহ মানুষের শব
দেখতে দেখতে দেখতে তার উজ্জ্বল শৈশবে
ফিরতে পারবে ভেবে এক অপার ইচ্ছায়
গাঢ়বর্ণ পাহাড়টাকে বারবার জড়িয়ে ধরছে। (সমর্পিত শৈশবে)

উদ্ধৃত কবিতার অনুষঙ্গ মিলতে পারে চিত্ত ঘোষের অপর একটি কবিতায়,

পাহাড়ের চূড়া ভাঙা
গাছের শিকড় কাটা
মঞ্চে এক ভয়ঙ্কর পাপ পরিণতির সম্মুখে (শবযাত্রী)

এই কবি আমার মন ও মননের বড় কাছাকাছি—এই কবিতা পড়ে আমি গভীর আত্মীয়তা অনুভব করি। নিম্নকণ্ঠ, স্বভাবসলজ্জ অথচ বক্তব্যে স্থির, চেতনার নিরাভরণ বিস্তৃতি। কবি হিসেবে আমরা কাছাকাছি, পরস্পর আত্মীয়, কিন্তু মজার বিষয়টি ভেবে দেখবার, আমাদের দুজনার রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনেকাংশেই পৃথক। দেখা যাচ্ছে রাজনীতির ব্যাপারটি সবসময় জীবনকে চালিত করে না। গভীর অর্থে যে জীবন তা অনেক বড় ব্যাপার, তার span সুদূরপ্রসারী। ভাবজগতের এই ঐক্যই প্রকৃত মিলনের সেতুবন্ধ। কবে সেদিন আসবে যখন কোন কবি বা শিল্পী বিশেষ বিশেষ ইজম্-এর প্রভাবমুক্ত হয়ে চিহ্নিত হবেন? আমাদের 'কমিটেড্' কবিরা কি বিষয়টি নিয়ে ভাববেন যাতে আমি অন্তত কিছুটা আলোক পেতে পারি?

১ সারদা ভট্টাচার্য স্কুলের সহপাঠী, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী। র‍্যাডিক্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সারদা একসময় কিছু কিছু লিখতেন, অশোক গুহ এবং আমরা ক'জন একত্রে একটি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকা প্রকাশ করেছিলুম ধ্রুব সরকারের সাহায্যে। শিল্পী এবং কবিতারসিক মণীন্দ্র মিত্র ভয়ঙ্কর একটি প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন—খুব কাটতি ছিল পত্রিকাটির। ধ্রুবদা আর নেই, কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে ধরা আছেন। বিমল কর কলেজ জীবনের বন্ধু, বর্তমানে বিশিষ্ট গল্পলেখক এবং ঔপন্যাসিক, উত্তরস্বরি-প্রকাশে যাঁর অবদান আগের সংখ্যাতেই আলোচিত হয়েছে। অশোক বসু ছোটবেলার বন্ধু, কেমিস্ট, বর্তমানে একটি বড় ফার্মের বড় সাহেব।

২ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় আমাদের যৌবনকালের বন্ধু, বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর প্রধান। হাল আমলের বাংলা কবিতা প্রচণ্ড ভালোবাসেন। সম্প্রতি তাঁর কিছু কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

৩. কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার সরকার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর *পরিচয় বাংলা কবিতার পাঠকদের নতুন করে দেবার কিছু নেই।

* মঙ্গলাচরণ এখন মস্কোতে, অনুবাদ-কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

অমিয় চক্রবর্তী

ঠেলা গাড়ির আখ্যান

বন-গাঁওনের বাইরে এলো বোঝাই ঠেলা-গাড়ি
ছোটো খেতের শস্যে ভরা মাটির কলসি হাঁড়ি—
ঝাঁকায় জড়ো দড়ির জালে শাকের আঁটি বাঁধা,
লাউ কুমড়ো কলার কাঁদি আলু বেগুন আদা,
লোকে বলে দাম কত গা? কচু কলাই ডাঁটা?
রামনবমীর ঠিক দুপুরে বেচারামের হাঁটা।
ঠেলা-গাড়ির গরীব মালিক ভাবে হাটে এসে
বাড়ি ফিরে মস্ত ঘুমে জিরিয়ে নেবে শেষে,
এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি, পিছল রাস্তা ঘাট
জলে ভরল মাঠ,
কড়কড়িয়ে বাজ ডেকেছে, ডঙ্কা-ভরা হাওয়া
আস্ত ভুতে-পাওয়া—
গড়গড়িয়ে ঠেলা-গাড়ি নামল খাঁড়ির দিকে
বেচারামের বুদ্ধি হোলো ফিকে,
পাগলা মেজাজ গাড়ির পিছে বল্গাবিহীন ছোটা
পড়ল তলায় পাথর কাদায়, সাঙ্গ হোলো ওঠা।
সব্‌জি গাড়ির বস্তা চাপা আমন ধানের নীচে
হারিয়েছে সব ফর্দ হিসেব, বেচাকেনা মিছে।
এদিক-ওদিক চায় বেচারাম, প্রাণটা নেশায় ঘিরে
অবচেতন ঠাণ্ডা হাওয়া বইল সাগরতীরে,
ঝিমিয়ে আসে ভিজে মাটি, ছিন্ন বেশের সরম
কাঁপিয়ে নামে কোন্ অদৃশ্য সূক্ষ্ম এবং চরম—

স্মৃতির ফাঁকে স্বপ্ন এলো, স্বপ্ন তো নয়, সত্যি
কাঁদছে হাবা সোনামণি মেয়েটা এক রত্তি,
হরিমতি সাধ্বী মা তার ভিজে চোখে তাকে
বলছে বাবা এই তো এলো, নিজেই কাঁদতে থাকে।
আরো অগাধ জলের হাওয়ায় ডুবছে যেজন তারি
এরি মধ্যে পলক-বিলোপ সমস্ত সংসারই
ধানের খেত আর সোঁদা গন্ধ, ছাউনি-দেয়া কুঠি
আরো আলোয় গোলে যেন স্বর্গ-সাধের মুঠি,
ধীরে বেরিয়ে আবেক সাগর অসীম মোহানাতে
ধরণীর এই সাধারণ লোক পারিজাতের প্রাতে
আপন হোলো , আপন যারা রইল মাটির দেশে
তারাও যাবে ঐ পথে তো পাপ-পুণ্যের শেষে—
"আগে-পরে" জানা কথা পরের আগে যাবা—
হঠাৎ গেল দূরে, তাদের পূজা হয় নি সারা
তাদের পূজা হয় নি সারা ॥

পৃথিবীতে বেচারামের ঠেলা-গাড়ির ধারে
ঠেলাঠেলি ভিড় জমেছে, পুরোত চুপি-সাড়ে
দক্ষিণা চায় ত্রাণ দেবে তাই, অন্তদিনের কর্ম
মানৎ-বিধি জানা সবই, পৈতে তাদের ধর্ম ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[আন্তর্জাতিক প্রহসন নয়, সত্যিকারের পৃথিবীর জন্য]

একটা পৃথিবী চাই
মায়ের আঁচলের মতো
আর যেন ঐ আঁচল জুড়ে
গান থাকে
যখন শিশুদের ঘুম পায়।

যেন অনেকক্ষণ
শিশুরা শান্তিতে ঘুমায়,
যখন ঘুম থেকে
তারা জেগে উঠবে,
যেন তাদের জন্য
মায়ের বুক খোলা থাকে।

একটা পৃথিবী চাই—
শুকনো কাঠের মতো মায়েদের
শরীরে কান্না নিয়ে নয়,
তাদের বুকভর্তি অফুরন্ত ভালবাসার
শস্য নিয়ে।

৪ মার্চ, ১৯৭৯

অরুণ ভট্টাচার্য

কবিতাগুচ্ছ

১. অসুখ হলে

হুদ্দাড় ভাঙছে জানালা-কপাট, শার্সি
মচকাচ্ছে খান্‌খান্‌, বুকের মধ্যে
হাতুড়ি পিটছে কড়াক্কর। ত্যাখো
আকাশের কী তাজ্জব নক্‌সা।

এধার থেকে ওধার ফুটে উঠছে গোপাল ঘোষের
তুলির টান। প্রকাণ্ড শ্লেটখানা
যেন নামছে আমার দিকে ক্রমশ, জলপ্রপাত
যেন পতনের মুহূর্তে
কী সব ভালোবাসার কথা বলবে বলে।

এমন সময় টিনের রিমঝিম, মাঝ-রাত্তিরে
কড়াক্কর, কাঁথার মধ্যে লণ্ঠনের
হঠাৎ-নেবা আলোর ধাক্কায়
কয়েকশো ভূত মুখ বাড়িয়ে আমাকে কিছু নক্সাকাটা
জলটুঙ্গি ঘরেব কথা জানিয়ে গেল

যেখানে অসুখ হলে বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে।

২০. ৭. ৭৮

২. যেন আম্রপল্লব প্রথম বর্ষায়

সমস্ত দুপুর ধরে ঘুম-তাড়ানী রাক্ষসগুলো
আমার চুলে বিলি কাটছিল।
আমার শরীর জুড়ে দেখতে দেখতে
গরুড় পাখির দুটি ডানা তৈরী হ'ল।

আমি মুহূর্তে আকাশবাতাস, উড়াল মাছের মত,
অবলীলায় সাঁতরে যেতে থাকলুম।
যেন কোন নক্ষত্রলোকের দিকে।

কখন ঘুম ভাঙলো জানি না। ঝিরঝির
হিমশীতল, শীতকালের কুয়াশা ভেজা বৃষ্টির ধারায়
আমার সমস্ত শরীর আর্দ্র, যেন
আম্রপল্লব প্রথম বর্ষায়।

২১. ৭. ৭৮.

৩. বলতে পারো রাজপুরীতে কে থাকে

তোমরা কেউ বলতে পারো, এই রাজপুরীতে কে থাকে ?

আমি দূর থেকে অনুভব করবার চেষ্টা করেছি,
কিন্তু না। মনে হয়, কাঠপিঁপড়েও এখানে
বাসা বাঁধে নি।

স্পষ্ট দেখতে পাই প্রস্তরবেদীতে
কে বা কারা আলিঙ্গনবদ্ধ, সেই ভয়ংকর নিঃশ্বাসের
ওঠানামা। কান পাতলে, পাতার মর্মর ঢেকে যায় কার
নিশীথিনী কান্নায়।

অথচ কোথাও কেউ নেই, শুধু এলোমেলো বিভ্রান্ত
হাওয়া। শুধু শিরীষের কঠিন স্তব্ধতা।
বলতে পারো, এই নিদারুণ রাজপুরীতে কে থাকে ?

নাকি দুটো ময়াল সাপ পাহারা দেয় এর খিলান,
স্ফটিক চত্বরে বুঝি ভুল করে ঘুরে বেড়ায়
প্রলুব্ধ শৃগাল। শুধু কান পাতলে
ঢেকে যায় পাতার মর্মর।

২২. ৭. ৭৮

আলোক সরকার

বিন্দু

তার বৌ আর মেয়ে এই ভিড়ের ভিতরেই আছে
খুঁজে বের করতে হবে তাকে।
ঠিক করতে হবে কোনদিকে যেতে হবে প্রথম
ওই নাগরদোলা উঠছে নামছে নাকি তার উল্টোদিক
তেলেভাজা গরম জিলিপির দোকান।
সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে ভিড় জমে উঠছে সমুদ্র
মাটির পুতুল বাঁশি হাতে লাফিয়ে দাপিয়ে চলেছে ছেলে।
খুঁজে বের করতে হবে তাকে।
পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলেছে ভিড় শব্দ ধাক্কা দিচ্ছে এ ওকে
আর সেই নীল ফ্রক মাথায় সোনালী জরির রিবন
আর সেই আকাশরঙের শাড়ি
এক প্রান্ত থেকে স'রে যাচ্ছে অন্য প্রান্ত। তাকে ঠিক করতে হবে
কোন বিন্দুতে দাঁড়াতে হবে অভ্রান্ত—ভিড় ছাপিয়ে ফেনিয়ে উঠছে
সরু হাতের চুড়ির ঝুমঝুম
আর সেই বড়ো বড়ো দুটো চোখ। আছে কোথাও একটা বিন্দু
ভিড় ঠেলে ভাসিয়ে দিচ্ছে তাকে ভাসতে ভাসতে ভাবছে
আছে কোথাও একটা বিন্দু।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

হাত বড় লোভী

এভাবে দুহাতে কাবো স্থলপদ্ম ভরে দিতে আছে ?

হাত বড় লোভী। তার তাপে
করস্থিত সব কিছু ঝলসে যায়, স্পৃষ্ট পোড়ামুখ
কী করে সঙ্কোচে

দেখাবে সম্পন্ন ফুল। গুঁজে রাখে মাথা
স্পর্শকামে একদা-বিশদ
হাতেরই পাতায়।
গ্রন্থিল আঙুলগুলি কী অসীম যত্নে ক্ষমাশীলা
শেষবিন্দু অন্তঃসারে ধোয়।
তবু তার অমোঘ স্খলন।
কুঁকড়ে পড়ে থাকে
রাস্তার ধুলোয়, ক্লিন্ন নদমার পাঁকে।

আর হাত ছুটে যায় ছুঁয়েছেনে নষ্ট করে দিতে
সুখস্পর্শ পেলব সচ্ছল
ভিন্নতর টগর, চম্পক।

কবিতা সিংহ

প্রেম

খানিক সকাল কিছু রাত্রির সময় তখন ত্রাস্ত
শিউলি ফুলের ঝরার সময় বোঁটায় আধোলগ্ন
ঘাসের ফুলে শিশির চানের আধ শুকনো আর্দ্র
তখনি ঘুম একটু ভেঙ্গে একটু ছুঁয়ে থাকল

অশ্রু যেন চোখের নীচে কোথাও হল তৈরী
একেই বুঝি প্রেম বলেছে কামের যাহা বৈরী।

তুমি

সহসা সময় সময় সহসা শান্ত
এমন শান্তি এমন অরূপ কান্ত
নামবে হৃদয়ে ফিরবে হৃদয় প্রান্ত
তুমি না জানালে কে আর এমনি জানতো?

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ব্রহ্মমানুষ

(রাজা রামমোহনকে মনে রেখে)

জন্মে প্রত্যেকেই শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক হলে বোঝা যায়
কে মানব, অমানব কারা, কার বেঁচে থাকা
আঁধারআক্রান্ত মূঢ় মানুষকে বাঁচায়।
আমাদের বাংলা ভাষায় মহামানব কথাটি আছে
মহাশিশু কখনো থাকে নি।

এ দেশ আমার দেশ—যদি বলি
কে মাথা নাড়াবে? গাছ, দৈব পাথর, হিমালয়ের চূড়ায়
যে বরফ আকাশকে ঠাণ্ডা রাখে
তারা কি উঠবে নড়ে। ঝর্না ক্রমশই নদী, নদী স্থায়ী ও প্রশস্ত হতে হতে
সাগরে পৌঁছেই গর্জন করবে
ভাখো 'আমি সেই আদি জল—একমেবাদ্বিতীয়ম্।'
যা কিছু নিসর্গ, তীরে তীরে সবুজ সম্পদ,
ধর্মলিপ্ত জনপদ—সব আমারি রচনা,
এ দেশ আমার দেশ, গঙ্গা—ইতিহাসই
এ দেশের প্রথম আসক্ত ইতিহাস।

নদী, তুমি ইতিহাস অথবা ভূগোল।
যে ভাবে মানুষ ভাত, জল, ফল খেতে
পৃথিবীতে আসে, অথবা না খেয়ে
প্রতিবাদহীন চলে যায়. সংখ্যাগরিষ্ঠ নরক অথবা
সংখ্যালঘু স্বর্গের ব্রহ্মপ্রদেশে
সে অতি অনাদি পন্থা—ব্রাহ্মণশ্লোকের সঙ্গে নদী তুমি
এ সবই জেনেছো, নর ও রমণী

এভাবেই যৌথ পন্থায় নিয়ে আসে
আরো বহু সদ্য হাঁটতে শেখা নর নারী।
দুজন বিদায় নেবে, শোক করতে রেখে যাবে অন্তত চারজন
এভাবে মৃত্যুর দুঃখে ক্রমশই বেড়ে ওঠে জীবনের সুখ।

সুখ? সুখ কাকে বলে
ভারতীয় দুঃখ সুখ কারা যে প্রথম
মন্দিরের অভিভাবক পাথরে ঢোকালো.
আগুনে পুড়ুক দেহ বধুর সিন্দুর
চিতার নিষ্পন্ন লালে মিশে হোক কালো
তবু আত্মাকে ছোঁবে না তাপ, তাকে কেউ দগ্ধ
অর্থাৎ প্রকৃত হত্যা করতে পারবে না।
ধর্ম যা হত্যা করে, হিন্দু আদালত তাকে কখনো ছোঁয় না,
ছোঁয় না বলেই তুমি তীব্র ছুঁয়ে দিলে হে ব্রহ্মমানুষ।
শুধু স্পর্শ নয়
সামাজিক জ্যান্ত ঝড়ের মধ্যে একা ঢুকে গেলে,
উপড়ে আনলে পুষ্প-সম্ভাবনাহীন ব্রাহ্মণ-বৃক্ষের সব অথর্ব শিকড়
ভাষাকে করলে নতুন তীর্থের প্রার্থী
"তৎসম" পিছিয়ে গেল, সমাসের সফলতায়
সুরু হ'লো বেশী কথা ক্রমশই কম ও নিপুণ করে বলা·

এখন যা আছে গভীর শিকড় হয়ে মাটির নিবিড়ে
ব্রহ্মধ্যান ও ধারণে, তা এভাবেই থেকে গেছে, ব্রহ্ম সত্য
জগৎও নেহাৎ মিথ্যা নয়—রাজা তুমি বুঝেছিলে
গ্রন্থের শতাব্দী ধর্ম মানুষের কল্পিত আলেখ্যে ভরে আছে,
তাই মানুষই টানটান দাঁড়াক না এসে
উন্মাদক রৌদ্রতাপে বিশেষণবর্জিত বর্বায়!
যে কোনো ধর্মই ভাল যদি তাকে সুস্থ ও বাস্তব করে

মন্দিরের অচেনা গাছে নির্বাধ কুসুমে
স্পৃষ্ট রেখে যাওয়া যায়।

হে রাজন, সমসাময়িকতা থেকে বড
হে অতিমানব! এ অপরাধীন দেশে
তোমাকে নতুন করে সংস্কারক ভাবি।
এখনো এ দেশে যত শিশু জন্মেই চীৎকার করে
তারা কেন ভগ্নাংশ মানব হয়েও গড়ে উঠতে পারছে না,
কেন শুধু রেডিয়ো ও সকালেব টাটকা কাগজে
ক্রমশই বাসী হয়ে উঠছে ভবতবাজার মহাদেশ,
ভূ-মানচিত্রের নিচু অংশে ভারতবর্ষীয় বেখায় যাকে
আকা-বাঁকা একা আঁকা হয়, সেখানে এখন
কে দাঁড়াবে সটান হয়ে
যাতে যে কোনো আধার, অবিচাব, হাহাকার থেকে
দেখা যায় তার স্বর্ণ-স্বাধীন মুখ।

মানুষেব প্রকৃত অভাবে মানবেব ফটো শুধু থেকে যায়
গ্রন্থের বন্ধন থেকে লক্ষ অক্ষর শুধু কালো কালো কলরব করে
স্বার্থপব স্মৃতি তাকে একবাবও সাহায্য কবে না।

শিশিরকুমার দাশ

সে বড বিস্ময়

ববং খেলা কবো টুকরো আলো নিয়ে
ববং সুখী থাকো খণ্ড সন্ধ্যায়
চেও না পূর্ণকে, সে বড় বিস্ময়, সে বড দুঃখেব।

ওখানে সুন্দর ফুলের গন্ধে
জড়িয়ে শুয়ে আছে কৃষ্ণ নাগিনী,

ওখানে খর রোদে আহত অঙ্গ
শালিক কেঁদে ফেরে তীক্ষ্ণ ক্রন্দন

দেখতে পারবে তুমি কি সাহসিনী
ক্ষুধা ও অনুতাপ কেমন প্রতিবেশী,
রক্তজ্যোৎস্নায় সুর তরঙ্গ
কী খেলা খেলে যায় অন্ধরাত্রি

পৃথিবী ভরে গেছে বিবাগী রৌদ্রে
সরল লুকোচুরি সাগরে বেলাতটে
ঝড়ে ও বিদ্যুতে সহজ বিনিময়
যদিও মেঘে মেঘে কুটিল গর্জন

বরং খেলা করো টুকরো মাটি নিয়ে
বরং সুখী থাকো খণ্ড শান্তিতে
চেও না পূর্ণকে, সে বড় বিঘ্ন, সে বড় দুঃখের

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃখী শষ্পলতা

দুঃখী শষ্পলতা, বুকে বাজল আমায় ছিঁড়ে ফেলতে ?
ঢেউয়ের মাথার মণি, বুকে বাজল আমার
ভালোবাসা ভাসিয়ে দিয়েছে গঙ্গাসাগরের দুঃখী দিনমানে···
বালির কাগজের মতো দেয়াল ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে, কোথাও
আড়াল নেই, হাউই লকেটে শত সুখ হয়ে ঝড়ে পড়ে দিন—
কোথাও আড়াল নেই—আগুনপাখী ঘুড়ির পাল্লা দিয়ে খোলা জিপগাড়ি

উড়িয়েপুড়িয়ে ঝাঁকা তছনছ করে আমতলার হাট পার হয়ে
ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটছে—আগুনশ্যেনের মতো ঝুঁকে আসে ঘুড়ি·

কোথাও আড়াল নেই, বালির কাগজের মতো সমস্ত দেয়াল ··
বিছানাপ্যাটরা তুলে চৌকাঠ পার হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—তক্ষক ডাকছে,
একবার, দুবার—রাস্তার দূরান্ত জুড়ে ঘোলা সাগরের দিকরেখা,
চারপাশ দিয়ে শতমুখ হয়ে ঝড়ে পড়ে দিন, দাঁড়িয়ে আছি—
পেছনের ফাঁকফুকো গলে আসে দুঃখী শষ্পলতা
বুকে বাজল আমায় ছিঁড়ে ফেলতে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

জন্মজন্মান্তর

ছাদে উঠে যায় সিঁড়ি
সেইখানে কারুব না কারুব ভালবাসা থাকে
জলচৌকির কুঁজো পিপাসা মেটায় কতজনেব
ভালবাসা কেবল একজন
এই শহরের একই আকাশ জোনাকি নক্ষত্রে
ভিক্টোরিয়ার গাছের ওপরে
এবং ঘিঞ্জি গলিব গ্যাসলাইট ম্লান করে দিয়ে
সেই সিঁড়ি উঠে যায় অন্ধকারে
রঙিন মালিনী কার আশায় আশায় পথ চায়
খুব দ্রুত অন্ধকারে সরে যায় এক একজন
ভালবাসা শুধু একজনের
আকুল প্রত্যাশা যায় অনন্তকালের
এ-জন্মেব শ্বাসকষ্ট অন্য জন্মের হাওয়ার প্রার্থনা।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ভুল, ভুলগুলি

ভুল, ভুলগুলি
হাতেব মুঠোয় নাড়াচাড়া কবতে করতে
তবু কিছু কিছু ভুল থেকে যায়

স্মৃতি, স্মৃতিগুলি
কখনো অন্যমনে উদাসী হাওযায়
আর এক স্মৃতির জন্ম দেয়

ভালোবাসা ভুলে, স্মৃতিতে
স্মৃতিতে, ভুলে কেমন হাত ধরাধরি করে
রক্তের মধ্যে খেলা করে

বক্তের রঙ একদিন লাল ছিল
রক্তেব মধ্যে একদিন ভালোবাসা ছিল
স্মৃতিব শিরাউপশিরা বেয়ে অথচ রক্ত একদিন
কেমন সংগোপনে শাদা হয়ে যায

জীবনে তবুও ভুল থেকে থেকে যায়
ভুলেব জন্যে ভুল, ভুল হয়ে থাকে ॥

বাসুদেব দেব

জামাকাপড

জামাকাপড়ের মধ্যে ছিল ডেঁয়ো পিঁপড়ের বাসা
ছিল ঘোলা জ্যোৎস্নার কুচি ঝড়ো হাওয়া মন্দ শীত
রাত্রির পাখির ডাকে জড়ানো হলুদ বাঁশপাতা
অদ্ভুত পুবনো গন্ধ রিপু কাজ নষ্ট শরীরের ভালোবাসা

সে সবই উপাধি ছিল মৃত্যুর ডাকের সাজ

শীতকালে সাংস্কৃতিক সমারোহ উজ্জ্বল ফেস্টুন
দীর্ঘ ছায়া পড়ে থাকে ঝিঁঝিরির মত ময়দানে
সেখানে ক্রমশ জড়ো হতে থাকে ছেড়া বাসের টিকিট
শেষে দেশলাই কাঠি ভাঙা কাপ প্লাস্টিকের ছেড়া লাল বল
রাগী ঠোঁট নত চোখ ব্যস্ত হাত পঙ্গু পায়ে চটি
'বন্ধ্যুৎসব বন্ধ্যুৎসব' শীতকালে সারারাত বন্ধ্যুৎসব হবে
গণিকা ও নক্ষত্রেরা ভ্রষ্ট পুলিশেরা সব হাততালি দেবে

আলনায় স্তূপ হয়ে উঠেছে অজস্র সব শরীরবিহীন
জামা ও কাপড় আর অলৌকিক আতরের ঘ্রাণে
তোমার করুণা যায় অশ্রু যায় ভূগর্ভরেলের খোলা খাতে

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

উত্তরণ

আলখাল্লা পরে, সেজেছি মাণিক-পীর ,
পর্দা সরে গেলে, পরম কৌতুক হবে।
অতঃপর কানা খোঁড়া বোবার মিছিলে
মিশে যাবো , তালপাতায় চাঁদোয়া
বানাবো। সেখানে শরীর আছে,
সেখানে শরীর ছাড়া কিছু নেই ,
স্বেদ, কাম, কাকের পুরীষ।
ঋতুরঙ্গে নিত্যই উৎসব ,
বসন্তে কোকিল ডাকে, শ্রাবণে
ময়ূর পুচ্ছ মেলে। বৃষ্টি হ'লে,
ঘরের চাতাল আর রজস্বলা নালী
সব একাকার, অধরোষ্ঠে পুণ্যতোয়া
ভাগীরথী। মাঝে মাঝে দেখা ক'রো,
ঈশ্বরের রূপ খুঁজে পাবে॥

বিজয়কুমার দত্ত

জাগরণে যায় বিভাবরী

নির্জন ভীড়ের মধ্যে যেতে যেতে দেখি
কোথাও আমার কোন ভূমিকা লিপির
ষ্টেজক্র্যাফ্‌ট নেই, নেই নির্দেশনা ঘরোয়া সংলাপ—
নাট্যকার খুঁজে ফেরা আমার অন্বিষ্ট নয় এই মাত্র জানি
আমি চাই, মৃত্যুর অনন্ত ব্যূহ মুখে
নেপথ্য সঙ্গীত—

সারারাত নিজস্ব নখবে
এখন হিমেল রক্ত হয়ে ওঠে খয়েরী-বভীন।

সুনীথ মজুমদার

নিজেকে গডব ব'লেই

নিজেকে গডব ব'লেই
রোদ্দুরের দিকে লতিয়ে উঠবো, এই বিশ্বাসে
আমি আমার মুহূর্তকে
পবিশ্রমের নানান শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে দিয়েছি।

সব চেয়ে খারাপ যেই দিন, সে-দিনের দিকে যদি বেড়ে উঠি
তারও জন্য প্রস্তুতি নিতে
আমি এখন নিজেকে পথের ভিড়ের মধ্যে একা দাঁড করিয়েছি।

পরিশ্রমই জীবন, এ-রকম সান্ত্বনায়
আমি এখন খুব দীপিত হই না—

নিজেকে গড়ব ব'লেই
রোদ্দুরকে খুব স্পষ্ট ক'রে চিনে নিতে চাই, আর
দু-পা রাখা যেই মাটি, মাটির নিচে যে অন্ধকার, তাকে।

পরেশ মণ্ডল

ডট্‌পেন

আমার একটা ডট্‌পেন ছিল
তার গায়ের রঙ লাল
তার কালির রঙ কালো
আমার একটা ডট্‌পেন ছিল
তার কোনো আকাশ ছিল না
তাব একটা নদী ছিল
আমার একটা ডট্‌পেন ছিল
সে ভাবতে পারত না
সে লিখতে পাবত
আমার একটা ডট্‌পেন ছিল
এখন নেই
আমার একটা ডট্‌পেন ছিল

প্রহ্যম্ন মিত্র

সহসা প্রেম

কেন আসো অনিকেত প্রত্যয়বিহীন,
পারস্পরিকভাবে রাখো ভাসমান
মুখ ও মদিরা, টের পাই বসতিবিলীন
মানুষের সমস্ত প্রত্যাশা শূন্যস্থান-
পূরণের খেলার মতন মনে হয়,
ছক ও ঘুঁটির দান ঠিকানা পাণ্টায় ,

তবু আসবেই তুমি নিয়তিনিশ্চিত
যেমন বসন্ত আসে অভ্যর্থনাহীন

মাঠে দেয়ালের ঘাটি ছাড়ে বার্তাহীন
দিন এবং নিজস্ব মন্ত্রে পুরোহিত
ঢাকে দায় শঙ্কা হিম, মাংচেরায়েব
শব্দে জেগে ওঠো প্রেম ধর্ষিতস্বর্গের
থেকে খসে পড়ে রক্তে শেষ অনুদান ,
রাগ শেষ হলে ফেরো রোদ্দুর সমান ॥

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তবু

অনেক প্রশস্ত হ'য়ে গেছে
বৃষ্টির সান্ত্বনা নেই
আগুনের হল্‌কাও নেই,
চোখ থেকে পাখিও উধাও
ত্বক জুড়ে শ্যাওলা নেমেছে।

তবু তো গাছের ডাল
নুয়ে পড়ে
অজান্তে ছোঁয়ায় হর্ষ রোমে,
অলক্ষ্যে ক্রমশ স্ফীত
আত্মভুক্ অতৃপ্ত ধমনী।

বিনোদ বেরা

যুবক

যুবকের ভিতরে যে যুবকটি থাকে
অভিমানে সে বড গোলাপী,
কিন্তু তার বাহিরের বর্মে ক্রোধ
লাল হিংসা প্রতিহিংসা ঝকমকায় ,
রূপ, প্রেম, স্নেহ ভালোবাসার তৃষ্ণায়
সে থাকে অস্থিব—দ্বিধাদ্বন্দ্বেব সোপান দ্রুত ভেঙে
ভিতরের ভিখারীকে বাহিরের স্পর্ধার ধমকে
সে করে শাসন।

যুবকেব স্বপ্ন অনুরঞ্জিত চোখের
দিগন্তে যুদ্ধের খেলা, রুক্ষ কোলাহল ধ্বংস শোক—
সব অতিক্রম ক'বে উপযুক্ত হ যে ওঠে একদিন
সে দাঁডায় পৃথিবীব মুখোমুখি,
মনোমত শিল্প সহবাসে
নিজেকে শহীদ করে দেয়।

প্রদীপ মুন্সী

আডালে

কেউ কিছু নিয়ে আসে না
তারপর
সকলেই সকলকে ফাঁকি দিয়ে
আড়ালে আবডালে
মুঠি ভরে নিয়ে যেতে চায়
মাটিতে গভীর পিছল
আর্ত করতল শুধু আকাশ ছুঁয়ে যায়

জগত্ত লাহা

বন্যার ছড়া '৭৮

মুখ ডুবেছে ঘাসে আমার চোখ ভেসেছে জলে
বুকের স্লুইস খুলে দিলাম উড়ানি বান আয়
বুক ভেসেছে জলে আমার সুখ ডুবেছে স্থলে
মেঘের মাদল বাজিয়ে আয় ভাসানি বান আয়

চোখ ডুবেছে ঘাসে আমার ঘর ভেসেছে জলে
বুক ডুবেছে মুখ ডুবেছে ডুবুরি বান আয়
হাত ছুঁয়েছি সাপে আমি ডুব দিয়েছি দহে
পিদিম ভাসাই ঢেউয়ে রে তোর চিতলবরণ গায়

হাত ছুঁয়েছি জলে আমি বিষ গিলেছি সাপের
ভাই গিলেছি ফুফু কশম সাপ গিলেছি পাপের
শোক গিলেছি স্তোক গিলেছি তালি রে তাই-তাই

সুখ গিলেছি চুক গিলেছি বাকিরুখুছাই
বুকের স্লুইস খুলে দিলাম ডুবানি বান আয়
মাঠ গিলে যা বাট গিলে যা কি-আছে-আর-নাই
বাবুবিবির কলজে নিবি ?—তাইরে নাইরে না।

যতীন্দ্রনাথ পাল

স্মৃতি ও স্নান

বাটা হলুদের গন্ধ তোর মুখ · তোর স্মৃতি
আমি সেই গন্ধের স্মৃতিতে স্নান সারি
প্রত্যেক মুহূর্ত
যখন কেউই নেই কোনখানে :

সমস্ত বাড়িতে একা গন্ধ বুকে মেখে
গায়ে মেখে আমি নিরিবিলি

একা একা দুচোখে ঘটে জল ভরে
স্নান সারি :

কোনদিন ছিলি তুই .
যেমন গাছের ছায়া নেমে যায় জলে ;
তোর হৃদয়ের মধ্যে মগ্নতা আকাঙ্ক্ষা ক'রে
দাঁড়িয়েছি ·

সারা গায়ে বুকে আজ বসন্তের ক্ষত ·
তার সব রঙ্, সব শ্রীময়তা নিবে গেছে ,
মাঝে মাঝে হলুদের গন্ধ জ্বালি .

বাটা হলুদের গন্ধ তোর মুখ তোর স্মৃতি ॥

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

শেষের কবিতা

ভেঙে আসে হাত
জলধারে কাঠকুটো, চোখে জলধারা দেখা যায়
ক্ষমা চেয়ে যাই ।

'গোরা' পড়ে বুঝেছি ছিল না
প্রথম পুত্রেব বিভা—
পবাজয়
অক্ষমেরে দেয় না মহিমা ।

ইতিহাস এইভাবে হয়েছে করুণ
দম্ভের সীমাকে ছেড়ে
নির্বাপিত হয়ে—
•
মানুষের সেই সিন্ধু জলে
এক ফোঁটা আমারও লবণ ।

কিরণশঙ্কর মৈত্র

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে

তোমার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম। তবু
তোমারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমার,
আমি প্রস্তুত।

তোমার গানে এবার
উথাল-পাতাল ঝোড়ো হাওয়া,
তোমার বিস্তৃত সীমানা জুড়ে
এবার কি তবে সূর্যাস্ত।

তুমি কি কোনও দিনও জানতে
এই সব রূপালি শিশির
মুছে যাবে শব্দের শরীর থেকে।

তোমার জন্মদিনে এসেছি তোমারই বিরুদ্ধে
শস্ত্রপাণি হয়ে। আমি প্রস্তুত এবার।

রবি ভট্টাচার্য

জন্মদিনের কবিতা

আমি আজ মেতেছি ভুলের খেলায়।

সকালে চশমা ছাড়া কাগজ পড়েছি
খাঁচার পাখিকে আকাশের ঠিকানা দিয়ে
উড়িয়ে দিয়েছি, দেয়ালে আয়নার মুখ ঠুসে
সাজিয়েছি উল্টোপাল্টা ঘর।

বালকের পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছি যে
আশীর্বাদ করো তোমার মতো হতে পারি।
রং-নাম্বারে কোন মহিলাকে জানিয়েছি
হেমন্তের শীতের রাতে সার্কাস দেখানো হোক
শহরে এখন, আরো সুস্থ প্রদর্শনী।
পার্কে-বসা বৃদ্ধের কানে নতমুখে হেসে
বলেছি, আপনি আজ খুব ভালো আছেন।

আমি আজ মেতেছি ভুলের খেলায়
আজ আমার জন্মদিন।

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

আমরা তিনজন

অনেক চাঁদ সুয্যি ঘুরে যায় বুড়ো চেল নদীর ধারে আকাশের কালো হাঁ
একদিন খেয়ে ফেলে বড চাঁদ আর আমাদের মাংস খাবার দিন
এসে গেল গুহার ভেতরে

আমাদেব পাথর আছে আমরা তিনজন
মা আর আক্কার হাতে গোল গোল পাথর—আ· ক্কা ··
তখন ভয় পায় আক্কাকে দাউ দাউ
আগুন জ্বালায় আক্কা আমবা ঝলসানো মাংস খাব আজ চেল নদীর তীরে
চিক চিক ছড়িয়ে পডছে চাঁদ অনেক চাঁদ সুয্যির পরে

মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে তুই আয় আক্কা
মাংসের গন্ধে আমরা ঘুবতে থাকব আগুনের চারপাশে আমাদের গান
আমরা ঘুবে ঘুরে নাচতে থাকব আক্কারে তুই
আমি তোর মানুষ তুই নে আমাকে

দিব্য মুখোপাধ্যায়

দৌড়

ছুটতে ছুটতে সবাই—
ক ছুটছে পূব দিকে
খ ছুটছে পশ্চিমে
গ ছুটছে উত্তর দিকে
ঘ ছুটছে দক্ষিণে

হঠাৎ চৌমাথার মোড়ে
ওদের একে অপরের সাথে দেখা—
ক বলল—'চল, পূব দিকে যাই'
খ বলল—'এসো না, পশ্চিমে'
গ বলল—'উত্তরে যাওয়া যাক'
ঘ বলল—'না না, চলো দক্ষিণে'

কেউ অন্যের পথে গেল না,
প্রত্যেকে নিজের পথ আঁকড়ে ছুটতে থাকল-

তারপর ভূমিকম্পের শেষে
চারটে রাস্তা এক হয়ে গেল।

অমিয়ভূষণ একটি ব্যাতক্রম

অমিয়ভূষণ আধুনিক সাহিত্যেব ব্যতিক্রম—একদা বলেছিলেন পুলকেশ দে সরকার। অমিয়ভূষণ একটি ব্যতিক্রম। সচেতন উপন্যাস লেখক তিনি, যিনি জানেন কী লিখবো আব কেমন করে, কেনইবা। "প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস পোর্টম্যাণ্টো নয় যে তার মধ্যে একই সঙ্গে মায়ের চিঠি, ফুটো মোজা ও ইস্তেহার জুড়ে আধুনিকতার গাড়িতে চড়া যাবে। উপন্যাস আমাদের কৌতূহল নিবাবণ কবে না এবং আমাদের অ্যাডোলেসেণ্ট যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিব উপায়ও নয়। ভেরিআর এলউইনেব নেফা সম্বন্ধে জানা ভালো। নাগাদের সম্বন্ধে উপন্যাস লিখতে নাগা হতে হয়। এবং তখন তা নাগাদেব সম্বন্ধে উপন্যাস হবে না। হোটেলের ওযেট্রেস ও বিসেপশ্যানিস্টদের জীবন যে কেচ্ছা (প্রেম বলে নাকি?) তা জানবার জন্য যা পডবো তাকে উপন্যাস বলে না। উপন্যাস গল্প নয় যে গল্পটা পাঠকেব মাথায় ঢুকেছে কিনা তা জানলেই ভাষা সম্বন্ধে সব জানা হলো। • ওদিকে আবার উপন্যাস ভাষাচর্চাও নয় যে ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন বলেই 'শেষের কবিতা' উপন্যাস হয়ে উঠবে উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে একটা থিম যা আমাদের চোখের নিচে ফুটে ওঠে। একটা থিম যা হ'যে ওঠে। অর্থাৎ থিম নামে এক জীবন্ত বিষয়ের ভাব।" (জনৈক ইম্মর্যালিস্টেব চিঠি"—অমিয়ভূষণ) উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর এই নিশ্চিত ভাবনাই অমিয়ভূষণকে সার্থকতায় পৌঁছে দেয়। তাই তার ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই এতই সহজ যে গল্পের বাধা আসবে বলে যেন সংকুচিত।

অমিযভূষণের প্রথম উপন্যাস "নীলভূঁইয়া" পড়ে সমালোচক তাঁর ভাষায় ঢেউ ও ফেনার নীচেকার undertow লক্ষ্য করেছেন। ঘটনার প্রতি উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সামন্ততন্ত্র, নীলকর, বিদেশী বিদ্বেষ, দেশাত্মবোধ সব কিছুই এখানে স্ব-বিরোধী। কোন কিছুই তীব্র নয়, আবার উপেক্ষারও নয়—এ এক ধরণের পরিস্থিতি। এই পথেই সংঘাত এসেছে উপন্যাসে, যার ঢেউ

লেগে উপন্যাস এগিয়ে গেছে পালতোলা জাহাজের মত। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৬০ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে আরম্ভ হয়ে ১৩৬১ বৈশাখে সংখ্যা পর্যন্ত 'নীলভূঁইয়া' "নয়নতারা" এই নামে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় 'নীলভূঁইয়া' নাম হয়েছে। এই নামকরণের স্বপক্ষে লেখকের বক্তব্য 'নীলভূঁইয়া' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কারণ এর সবগুলি চরিত্রই কাল্পনিক। আবার, এটি ঐতিহাসিকও, যেহেতু তৎকালীন নীলাক্ত সমাজকে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।"

কিন্তু এই নাম পরিবর্তন পাঠকের দৃষ্টিকে নীলাক্ত সমাজের প্রতি আকৃষ্ট করায় না বলে, সমালোচক মনে করেছেন। "নীলাক্ত সমাজের নামে নীল চাষ ও তাঁতীদের সম্পর্কে যে ঔৎসুক্য ও প্রত্যাশা জাগে তাও এখানে অনুপস্থিত বাজু নয়নতারার সহজিয়া, পরকীয়া বা যে কোন জাতীয় প্রেমই হোক না কেন, তাও নীলাক্ত সমাজের পরিচয় হতে পারে না।" (পুলকেশ দে সরকার)

নয়নতারা মুক্ত নারী। তার এই মুক্ত জীবনেব ব্যবহার খুব স্বাভাবিক? এই প্রশ্নের উত্তরে সমালোচক দ্বিধাবিভক্ত। "একালের লেখা" ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "নয়নতাবা চরিত্রটির function কি? তাব প্রকৃতি না হয় বুঝলাম। নযনতাবা মুক্ত নারী—emancipation নয়, free, এটাই লেখকেব উদ্দেশ্য মনে হয়। অথচ সে নিশ্চয়ই হিন্দুদর্শনের প্রকৃতি নয় (বাজুও পুরুষ নয) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রকার মেয়ে চরিত্র সৃষ্টি করেন যার অনাবিল স্বাধীনতা অনেকটা মূল প্রকৃতির মতন। হাওয়ার মতন তার গতিবিধি, willy, nilly, blowing—তবু সে চালাচ্ছে কাউকে না কাউকে। নয়নতাবার মধ্যে যেখানে dynamic element পাচ্ছি সেখানেই তার ব্যবহার (behaviour) অস্বাভাবিক এবং এতটাই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে যে তখনই তাব মুক্ত অস্তিত্বতে সন্দিহান হয়ে পডেছি⋯অর্থাৎ আমার মতে নয়নতারা অসম্পূর্ণ।" [উত্তরসূরী ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা]। উপন্যাসটির বিষন্ন উপসংহার আশ্চর্যভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় কুসংস্কারের ধাক্কায় রাণী ঘরছাড়া, প্রগতিশীল হরদয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে কাত-হয়ে-পড়ে থাকা সুরকি-কলের চাকায় বসে থাকে। অমিয়ভূষণের মহৎ সৃষ্টির প্রস্তুতি এটি, যার পরিণতি "গড় শ্রীখণ্ডে"।

'নীলভূঁইয়া', 'গড় শ্রীখণ্ড' ও 'নির্বাস' এই তিনটি উপন্যাসকে বলা যায় অমিয়বাবুর "ত্রয়ী" উপন্যাস। সময় সচেতনতা ও দৃষ্টিভঙ্গির নৈকট্য এই তিনটি

উপন্যাসের যোগসূত্র। 'তিনটি উপন্যাসই কমবেশী ঐতিহাসিক, কেননা তারা প্রবহমান ইতিহাসেরই অঙ্গীকার অঙ্গে মেখেছে। লেখক যাই বলুন না, শুধু কল্পনার ফসল এগুলো নয়। আর একটি কথা বলা ভাল, অমিয়ভূষণ মানেই, পাঠকের কাছে এই ত্রয়ী উপন্যাস। এই উপন্যাসের অমিয়ভূষণই পাঠকের মন টানে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভিন্ন স্বাদের উপন্যাসের জন্ম লক্ষ্য করা গেল। জগৎ-জোড়া পরিবর্তনের যে ফসল বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে গগনচারী সাহিত্যের গগন-বিহার পরিত্যাগ করে মাটিতে নেমে আসার প্রচেষ্টা। 'যে আছে মাটির কাছাকাছি' সেই কবির বাণী রবীন্দ্রনাথ শুনতে চেয়েছিলেন। আজও অবশ্য সে কবির একতারা অনুপস্থিত। তথাপি বাংলা সাহিত্যে বৈপ্লবিক চেতনা বলতে যা বোঝায় (অথবা বলি বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টির একটা প্রচেষ্টা) এই সময়েই দেখা যায়। এই প্রসঙ্গেই বিভূতিভূষণ—তারাশঙ্কর —মানিকের নাম মনে আসবে। বিশেষভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে চরিত্রগুলোর মানস উদঘাটনের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর পথ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের পথ। শুধু গল্প বলাই উপন্যাসের কাজ একথা আর মানবার কারণ রইলো না। মানুষের বিচিত্র চিন্তা-ভাবনার উৎস সন্ধানে যাত্রা করার শুভক্ষণে বাস্তব জীবনের তুচ্ছ কুকুরটিও সাহিত্যের স্বর্গ-দ্বারে এসে উপস্থিত হল। সাহিত্য সত্যিকারেই জীবনের কাছে এসে দাঁড়াল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, ধনতন্ত্রের অসংগতি, ভেঙ্গে-পড়া সামন্ততন্ত্রের বদলে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি, দেশনায়কদের স্বার্থে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ সব কিছুই উপন্যাসের উপজীব্য হল। এ যেন বাংলা উপন্যাসের ঋতু পরিবর্তন ঠিক গঙ্গার মতই।

তারাশঙ্করের 'গণদেবতা—পঞ্চগ্রাম' রাঢ়বঙ্গের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের দলিল। গ্রামবাংলার দ্রুত পরিবর্তিত চেহারা 'গণদেবতা' আর 'পঞ্চগ্রাম'এর পাতায় পাতায়। তাই এগুলো শুধুই উপন্যাস নয়—বদলে যাওয়া সমাজের ইতিহাস, সুতরাং ভাল-মন্দের মাপকাঠিতে শুধু বিচার্য নয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বিশ্বযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত সঞ্জাত পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামো। আর বরেন্দ্রভূমির পটভূমিতে বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ ইত্যাদির সময়-সীমায় রচিত 'গড়শ্রীখণ্ডে' রয়েছে মানবিক আবেগ ও মূল্যবোধের সংঘাত,

ইতিহাসবোধ ও মাটি ও মানুষের প্রতি অখণ্ড দরদ। এখানে কোন বিশেষ চরিত্র বড় কথা নয়, দেশভাগ-জনিত পরিস্থিতি ও ভাঙ্গা-গড়ার নদী পদ্মাই যেন মিলেমিশে একটি চরিত্র। শুধু বুধে ভাঙ্গাব নয়, এ তো এক বিস্তীর্ণ জনপদের ভাঙ্গাগড়াব পদাবলী। অমিয়ভূষণ মজুমদাবের উপন্যাস কি আঞ্চলিক অভিধায় সীমিত? না তাকে এই আঞ্চলিকতায় আবদ্ধ কবা যায? এ প্রশ্নেব উত্তর ইতিবাচক হ'তে পাবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', তারাশঙ্করেব 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' পাঠকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করবেই। অমিয়ভূষণের 'গড শ্রীখণ্ড' অনেকটা এর কাছাকাছি আলোচ্য উপন্যাসেব লেখকগণ যুগ পরিবর্তনের চারণ কবি। হতাশা দৈন্য রাজনৈতিক প্রতাবণা, প্রাকৃতিক বন্যা—সবকিছুকে ছাড়িয়ে জীবনের মহৎ উপলব্ধিতে 'গড শ্রীখণ্ডের' পবিসমাপ্তি। উপসংহাব দুঃখজনক হলেও 'নীলভূঁইয়া'র মত হতাশা-পূর্ণ নয়। কারণ লেখক জীবনের মহান্ জযগানে, মহৎ সম্ভাবনায় নিশ্চিত বিশ্বাসী। জীবন তো পদ্মাবই মত একটা কিছু, যা প্রতিক্ষণেই সম্ভাবনায় পূর্ণ, দুঃখে-দুর্যোগে আলোয-কালোয় মোড়া। "এই প্রলয় শেষ কথা নয়। এর পরেও আছে জীবন, যে পদ্মার মত একটা কিছু। এই জীবন রহস্যময়, তা' এক মুহূর্তে কোন প্রতিরোধ ধ্বসিয়ে আবর্তে ধানে মানুষ কে তা' কেউ জানে না। তবু এরই মধ্যে আহার ও আশ্রয়ের সন্ধানে চলেছে মানুষ। এই মহৎ উপলব্ধিতে এ উপন্যাসের সমাপ্তি।" ("কথাসাহিত্য" অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। অবশ্য উভয়েই উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছেন। অমিয়ভূষণ এই পথেরই যাত্রী। 'গড শ্রীখণ্ড' তাঁর শ্রেষ্ঠতম ফসল। গভীরভাবে ভাবা যে ভাবনা উপন্যাসের থিম-কে তরঙ্গে তরঙ্গে জীবন্ত করে তোলে তারই ফলশ্রুতি দেখি গড়শ্রীখণ্ডে। তত্ত্ব দিয় যা বোঝানো যায় না অতি সহজেই অমিয়-ভূষণ তা' বুঝতে পেরেছেন। এই উপন্যাস পড়ে বার বার মনে হয়েছে—
"চাষী আর চষা মাটি এই দুই নিয়ে দেশ খাঁটি।'

"জমি জমিই। বিশেষ করে জোলার (নাবলাভূমি) জমি। একসঙ্গে তিন চাষ। আউস, আমন, কালাই। আউশ তোলো, নামুক ঢল্। জল বাড়বি,

আমন বাড়বি। এক হাত বাড়ে জল, সোয়া হাত আমন। কাটৌ সোনার আমন। জল কমবি জল শুকায়ে যাবি। একাকারে শুকানোর আগে ছলছলায় কাদায় ছিটাও কলাই। ধরো যে চাষই নাই'। আবার বন্যার প্রলয়ের পর ফসলের প্রতিতিতে উন্মুখ গঙ্গার চর—কিন্তু দেখা গেলো এক কোমর পলি রেখে গেছে। নর্তকীর দৃষ্টির প্রসাদ-ই নয় যেন, তার আলিঙ্গন। বুড়ো জোয়ান হয়ে উঠবে এমন লক্ষণ দেখা দিলো।" চাষীর কাছে চাষের জমি যে তার কত আপন এই সত্যই বার বার এই উপন্যাসে দেখে পাঠক আনন্দিত।

কিন্তু এরই মাঝে দেশ ভাগ, স্বদেশ প্রেমের বর্শা হাতে ভবিষ্যতের দেশ কাণ্ডারী। হায় স্বদেশ হায়রে স্বরাজ—অসহযোগের পরিণতি।

'দেশ নাকি ভাগ হতিছে?'

'বুঝি না। কোনকার কোন দুই রাজা যুদ্ধ বাঁধালে একবার, ধান না পায়ে উজাড় হ'লাম। কবে কোন্ শহরে দুজনে বাধালে কাজিয়া, খেত-খামারের কাজ বন্ধ করলাম। আবার দেখো কন থিকে কোন দুইজন আসে দেশভাগ করতিছে'। সাধারণ মানুষের tragedy এটাই। রাজনীতি না করলেও, ভূমির প্রতি বিশ্বস্ত হলেও, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য থাকলেও রেহাই মিলে না কারো। এইসব বিপরীত স্রোতের দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিকে করে তুলেছে অসামান্য। পাঠক কখনো ভুলতে পারে না—'বুঝ্‌লা বেহাই, তখন মনে হতো, পৃথিমি পাই চষি। একদিন মনে হইছিলো, চাঁদে অত জমি দেখি, চাষ দেখি না।'

অমিয়ভূষণের ত্রয়ীর আর একটি উপন্যাস 'নির্বাস'। নির্বাস দেশভাগের পরবর্তী অবস্থার ছবি। উদ্বাস্তু সমাজ ও তথাকথিত নিষ্ফলা রাজনীতির প্রায় প্রামাণ্য দলিল। এটি কোন রাজনৈতিক ইতিহাস নয় বলে লেখক মনে করেন। সমালোচক কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারণ ইংরেজ-কংগ্রেস-লীগ রাজনীতির একটা দৈত্য সব সময় "উদ্বাস্তু" নামে এক নোতুন সমাজভুক্ত মানুষকে কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে এসেছে। আর এ সবই বাস্তব সত্য ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তাই বিমলা যখন বলে—"রাজনৈতিক দলের হ'য়ে চাঁদার কৌটো নিয়ে বেড়ানোকে রাজনীতিই বলা যেতে পারে।" অথবা যখন

বলে—"রাজনীতির সুতো টানছে কেউ আর আমরা হাত-পা ছুঁড়ছি। ভাবছি সেটাই বাঁচা।" আবার নিজ অভিজ্ঞতায় বিমলা যখন শেখে—"ধর্ম আর রাজনীতি যেন হাত ধরে চলেছে"। তখন নির্বাস আর শুধু উপন্যাস থাকে না। এও হয়ে ওঠে সমসাময়িক ইতিহাস আর তা রাজনীতি বর্জিতও নয়। সমালোচক সংগত কারণেই বলেছেন :

পূর্ববর্তীকালে প্রকাশিত 'গড শ্রীখণ্ড' যেখানে শেষ 'নির্বাস' নিঃসন্দেহে তার পরবর্তী চিত্র, কিন্তু বলতে কুণ্ঠা নেই, নির্বাস 'গড় শ্রীখণ্ডে'র মত কৌলীন্য দাবি করতে পারে না। রাজনীতিকদের নির্লজ্জ আবেগে ভারতমাতা ধর্ষিত হয়েছেন সত্যি কিন্তু তাতো বিমলার আত্মপক্ষ সমর্থনের সলিলকি নয়। ··অমিয়ভূষণ উদ্বাস্তুদের জীবন যতখানি নৈর্ব্যক্তিকভাবে সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ করতে পেরেছেন এমন খুব কম লোকই পেরেছেন। (গণবার্তা · পুলকেশ দে সরকার)

আবার কোন কোন সমালোচক 'নির্বাস'-কে 'গডশ্রীখণ্ডে'র চেয়ে সার্থকতর সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছেন—"গড শ্রীখণ্ড মূল্যবান মণিমুক্তোর ডালি, কিন্তু সোনার সুতোয় গাঁথা মুক্তোর মালা নয়। নির্বাস মালা নয়, এক টুকরো টলমলে মুক্তো। যে অপরিসীম ধৈর্যে ও সাধনায় অমিয়ভূষণ জীবনকে জানতে চেয়েছেন, সাহিত্যপথে নতুনতর দিক্ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন—তার সার্থক পরিণতি ঘটেছে নির্বাসে।" (পূর্বপত্র অনিল চক্রবর্তী)

১৯৫৫—১৯৬০ এই সময়ে প্রকাশিত নীলভূঁইয়া, গড-শ্রীখণ্ড ও নির্বাস এই তিনকে নিয়েই অমিয়ভূষণের ত্রয়ী উপন্যাস। ছোট গল্পে, প্রবন্ধে অমিয়ভূষণের দক্ষতার কথা স্মরণ করেও (আলোচ্য প্রবন্ধে এসব প্রসঙ্গে কথা বলবো না) একই পটভূমিতে এক অখণ্ড জীবনবোধ ও ইতিহাস সচেতনার পরিচয় মিলবে। আর দু'টো কথা এই প্রবন্ধের শেষে বলা যেতে পারে, অবশ্যই এই প্রসঙ্গ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিছক কাহিনী পাঠে অভ্যস্ত পাঠক অমিয়ভূষণের কাহিনী উপস্থাপনার কৌশল ও পরিমিত ভাষণের বুদ্ধিদীপ্ত চালকে বুঝতে পারেন না। জনৈক সমালোচক সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে অমিয়ভূষণের গদ্য তাঁর পক্ষে বুঝে ওঠা দায়। কিন্তু অমিয়ভূষণের পাঠক মাত্রেই জানেন বাংলা সাহিত্যে তাঁর যদি কিছুমাত্র স্বকীয়তা থেকে থাকে তা' তার গদ্যভঙ্গির জন্যই। অমিয়ভূষণের গদ্য শুধু তাঁকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর চরিত্র অতি সতর্ক, গদ্যভঙ্গির বাঁধ কখনো

ভাঙে না। তাঁর ভাষা চিন্তার ভাষা। ভঙ্গি এড়িয়ে নোতুন ভঙ্গি তৈরী করে তার গদ্য। শব্দের ধার, ভার ও ক্ষমতাকে সদা-সর্বদা মনে রেখে শব্দের ব্যবহার করেন তিনি। অমিয়ভূষণের নিজের কথায়—"আসল কথা উপন্যাস একটা কলা পরিণতি। তার গদ্যকে তার থেকে আলাদা করা প্রকৃতপক্ষে যায় না।"

অমিয়ভূষণের "ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড" পড়ে প্রথম বার যারা কষ্ট স্বীকার করেছেন তারা আর একবার ওটি পড়বেন কি? অবশ্য আমরা মনে করি, "ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড" অমিয়বাবুর প্রতিভার পাশ-ফেরা—ভাল-মন্দের কথা অবান্তর সে ক্ষেত্রে। আর মনে করি এটা তার স্ব-ক্ষেত্রও নয়।

অমিয়ভূষণ সজ্ঞানে বাঙ্গালী-সুলভ বর্ণনাব অতি মাত্রিক ঝোঁক এড়াতে পেরেছেন। সংযত ও পরিমিত বর্ণনায় পরিবেশ ও চরিত্রকে সহজেই তুলে ধরতে জানেন।

'জল ও জঙ্গল নিয়ে জাঙ্গাল-বাঙ্গাল বাংলা দেশের এক গৈ-গাঁয়ের মেয়ে সুরো, সুরতু নেনহা। ব্রাত্য 'সান্দার' বংশে তার জন্ম। বাপ নেই ভাববে, মা নেই কাঁদবে। চর বুধে ডাঙার মেয়ে।' গড শ্রীখণ্ডের সুরতু নেনহা।

"চিকন ঠাণ্ডা কালো রঙ্, টিকলো নাক, টানা চোখ, বলে চক্ষু, সে চোখের প্রান্তগুলি আবার লাল, গায়ে মোটা তসরের মেরজাই পরনে দু-আঙুল চওড়া পাড়, খাটো কিন্তু সূক্ষ্ম ধুতি। লক্ষ্য করলে দেখা যায় টিকলো নাকের উপরে চুলের মত সূক্ষ্ম করে রসকলি। পায়ে চামড়ার কটকি।" 'মধু সাধু খাঁ' গল্পের সদৃশ চরিত্রটি জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে এই বর্ণনায়।

সংবাদপত্রের প্রচণ্ড প্রভাব নানাভাবে সাহিত্যের ওপর পড়েছে। যে কজন মুষ্টিমেয় কবি ঔপন্যাসিক ও গল্পকাব এই প্রভাব কাটিয়ে নিজের চেতনার কাছে সুস্থির রয়েছেন অমিয়ভূষণ তাঁদের অন্যতম। তাঁর কাছে আমাদের সেকারণেই আশা থেকে গিয়েছে।

দিগ্বিজয় দে সরকার

নতুন কবিতা

[বাংলা আধুনিক কবিতার জগতে সবচেয়ে বড় এবং নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে 'উত্তরসূরি'র পৃষ্ঠায়। গ্রাম বাংলার এবং কলকাতার, শহরতলীর অজস্র অসংখ্য 'লিটল ম্যাগাজিন' থেকে অতি যত্নে কবিতা উদ্ধার করে সম্পাদক প্রমাণ করেছেন কত ভালো কবিতা অনাদরে অবহেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। বাংলা কবিতার ইতিহাস যেদিন সাধক লেখা হবে তখন এই নিঃশব্দ বিপ্লব একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে থাকবে।

মৃত্যুঞ্জয় সেন

একটি বিজ্ঞাপন

কলিকাতা হইতে মাত্র আশী মাইল দূরে।
সৌন্দর্য আছে সেথা আপনার সুরে ॥
ঘণ্টা তিনেক যাত্রা সেথায় পৌঁছাইতে।
স্বপ্নরূপ না লেখা যায় এ বহিতে ॥
কবি হৌন প্রেমিক হৌন কিংবা সংসারী।
বকখালিতে এলে মন থাকে না ভারি ॥
বিষ কণ্ঠে নিতেই আছে ট্যুরিস্ট লজ ॥
স্বর্গ তাকে ভাবার অনেক আছে 'কজ' ॥

ভগ্ন হৃদয় শরীফ করতে আসুন।
নয়নশোভা প্রকৃতিকে ভালোবাসুন ॥
ঢেউ-এর চূড়া রূপালি শিকলমালা।
হেথা আকাশ রঙে চকমকির থালা ॥
বকখালির সৌন্দর্য অমৃত সমান।
মৃত্যুঞ্জয় সেন কহে দেখে ভাগ্যবান ॥

[মহাদিগন্ত। মহাদিগন্ত মুদ্রণী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা ॥]

সুব্রত চেল

বিছানা

প্রত্যেকদিন নিজেকে একটা বিছানার মত করে সাজাই
আর সবাইকে ডেকে ডেকে বলি
এসো বসে পড়ো এসো শুয়ে পড়ো
আর তো আমাদের কোন কাজ নেই।

বিছানার কথা ভাবতে ভাবতে
একদিন কেন জানি নিজেকে একটা বিছানার মত মনে হলো
একটা সাদা ধবধবে বিছানা
যা সারাদিন ভেসে বেড়ায় আমাদের মনে
আর অপেক্ষা করে শুধুই অপেক্ষা করে একটা দেহের জন্য
একটা নরম সুশীতল দেহ যাকে আদর করার জন্য
শৈশবে শিখে এসেছে বাবা মায়ের কাছে
আর সারা জীবন পড়েছে এত এত পাঠ্যপুস্তক।

[একলব্য। রাণী কুটীর, বৈলাপাড়া, বিষ্ণুপুর॥]

মিঠু মুখোপাধ্যায়

ঘুম

নিজের মধ্যে মানুষ ডুবুরী হয় নিজে একদা এবং এখন

পদাতিক শব্দেরা ঘিরে থাকে কিছু পরিচিত চোখ
এইভাবে মানুষ ক্রমশ স্মৃতির চৌকাঠ ছুঁয়ে যায়

বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে একদা সেই কিশোরী বলেছিল, মনে
জ্যোৎস্নায় চুরি হয় সব ভালোবাসা এবং জীবনের স্বাদ
আশ্রয় খুঁজে নেয় বেওয়ারিশ ঘোড়ার দল   এইভাবে
বেদনাতুর হয়ে ওঠে গৃহস্থের ঘর গৃহস্থালী·········

উদয়ন ঘোষ

তাকে তুই কোথা হারালি

আহা, কে তোর চোখের আগুন
এমন সাতসকালে কেড়ে নেয় ?
কে রে সেই দুরাচার,
তোকে এমন একঘরে করে ?
স্বর্গের চেয়ে বড় করে
তোকে যে জন্মভূমি দিলাম
তাকে তুই কোথায় হারালি ?

[প্রমিথিউস। ক্যালকাটা প্রিন্টার্স, আসানসোল।]

রূপাই সামন্ত

ষোড়শী যে চোখ ভালবাসে

ওই সেই চোখ এক জোড়া নীলকান্ত মণি নয় অথচ বিশাল
গভীর হৃদয়ে সমুদ্রচর মাছের মতো খেলা করে
স্তব্ধ হয়   কিছুই দেখে না   দেখে কি ?
তোরা বল পিয়ালী অনীতা রুণা ঐ চোখ ভালোবেসে
বিষিয়ে গিয়েছে হায় অমল বুকের শিরা চিন্তা ও চরিত্র

দিনের আকাশে আমার সূর্য ছিল রাত্রে ছিল চাঁদ, ভোরবেলায়
লাল মৌমাছির মতো গন্ধ ছিল, নিমফুলে চাপা হাসি ছিল
মরাল উড়তো সন্ধ্যায়   আলোছায়া খেলা করতো মুখে
এখন শংখের শব্দে লক্ষ্মীপুজা হলেও দেখেছি সমস্ত বড কটু
বিস্বাদ বিষ যেন মৃত্যুকে বহন করে আনে

অথচ মরার কথা ভাববার সময় কই বল নীপা বল এই
মধুসিক্ত বসন্ত বিকেলে মহুয়া গাছের ডালে হলুদ পাখির
মতো বসে আছে আমার ষোড়শী বয়েস কখন দু'চোখ তুলে
আমার দেখবে সে কনেদেখা করুণ আলোয় ॥

[অবান্তর। ফুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া]

মঞ্জু ভাদুড়ী

ঝড়বৃষ্টি

কাল সারারাত বৃষ্টি।
ধ্বস নামে পাহাড়ে বন্দরে
খবর এসেছে আজ,
কালভার্ট চৌচির
জলস্রোত বহে গেছে—
বনস্থলী ছিন্ন ভিন্ন,
জলো মাঠে কপোত কপোতি পড়ে আছে।

কাল সারা রাত বৃষ্টি
ধ্বস নামে বুকের গভীরে।
নীলাঞ্জন,
দেরি হয়ে গেছে—
বড দেরী।
এখন ভেঙেছে ঘর, ঘরের ভিতর।
ছিন্ন ভিন্ন এলোমেলো পড়ে আছে সব।

জলস্রোত বড্ড দ্রুত বহে যায়।

[সপ্তদ্বীপা। ১।১২৪ কংকরবাপ কলোনী, পাটনা-২০ ॥]

বাদল মাঝি

পাঞ্চজন্য বেজে উঠল

সভাস্থ প্রাজ্ঞজনের নিকট দূরত্বেই
অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই কপট পাশা খেলা
খেলায় সে হেরে গেছে।

একে একে পণ রেখেছিল রত্নরাজি সোনার কলস
প্রিয় বাসভূমি
সবশেষে দ্রৌপদীকে।

সব ক'টি বাজিতেই সে হেরেছে।

এখন সভার মধ্যেই ঘটে যাচ্ছে
অবিবেকী ও অশালীন ঘটনা,
দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ছে দুঃশাসন

তবুও ধৃতিমান বিজিত মানুষটি পাণ্ডব-শক্তিকে
নিয়ন্ত্রণে রেখে
অজ্ঞাতবাসসহ বনবাসের
অন্যায় শর্তাবলী মাথায় নিলে।

সে জানে, অজ্ঞাতবাসেই, আগামী
মহাযুদ্ধের মহড়া চূড়ান্ত হবে
সে জানে পাঞ্চজন্য বেজে উঠলে কুরুক্ষেত্রের মাঠে
আজকের প্রাজ্ঞজনের সামনেই
পাণ্ডব-শক্তি একে একে জিতে নেবে
সমস্ত হারানো সম্পদ।

[অগ্নিশিখা। লিপিকা প্রেস, ২৮৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, বজবজ ৭৪৩৩১৯ ॥]

অমিতাভ গুপ্ত

ডাক

অন্ধকারের মাদল যখন বেজে উঠলো, দুয়ার গেলো খুলে
ডাক দিলো সেই পাগল
ছড়িয়ে থাকা দুঃখ এবং অবহেলার কাঁটার উপর পা রেখেছি
ডাক শুনে তার মাড়িয়ে যাবো, অপমানের সকল ছায়া
ছাড়িয়ে যাবো
হারিয়ে যাবো, মেঘে মলিন পাহাড় চূড়াও
পেরিয়ে যাবো বলে।
পাগল ছিলো চন্দ্রালোকে, অন্ধকারে আনলো তাকে কে ?
হয়ত' আমার আঁধারভরা ঘর ও বাহির দেখে, দয়ায়
আমারই খুব কাছে এসে আসন বিছিয়েছে।
চকিত সংকেতে তার ঘরের চৌকাঠের পরে দুলে উঠলো
কালো সাপের ফণা
প্রবল, নীলবিষের মতো জ্বলে উঠলো আগুন, পরমুহূর্তেই,
শূন্যতার ভারে
কেঁপে উঠলো সহস্র নাগ, আগুন জেলে পথ দেখাবে বলে
বাঁশিতে তার সুর তুলেছে সে।

[আবর্ত ২।৪৩ নাকতলা, কলকাতা ৪৭ ॥]

হোটেল রনমুথ্
কলম্বো
১ জানুয়ারী, '৭৯

[অরুণ ভট্টাচার্যকে লিখিত]

শ্রদ্ধেয় অরুণদা,

প্রায় আকস্মিকভাবে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পঞ্চাশ জন ও বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আরো পঞ্চাশ ষাট জন প্রতিনিধি এখানে সমবেত হয়েছে। অত্যন্ত অল্প সময়ে তৈরী হ'তে হয়েছে বলে সঙ্গে বইপত্র প্রায় আনি নি। কিন্তু 'উত্তরসূরী'র 'অমিয় চক্রবর্তীকে নিবেদিত' সংখ্যাটি সঙ্গে আনতে ভুলি নি। এ-সাখ্যাটি সম্পর্কেই আমার সামান্য বক্তব্য আপনাকে জানাতে চাই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার একজন ভক্ত পাঠক হিসেবে।

অমিয় চক্রবর্তী বর্তমান জীবিত বাঙালি কবিদের মধ্যে শুধু যে প্রবীণতম, তা-ই নয়, কাব্যগত কোনো-কোনো বিচারে প্রধানতম কবিও তিনিই। অথচ, অত্যন্ত পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়, তাঁকে কেন্দ্র ক'রে, অজস্র পত্র-পত্রিকা-সমাকীর্ণ হতভাগ্য এই দেশে কোনো সাহিত্যপত্রের কোনো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হ'তে আজ পর্যন্ত দেখা গেলো না। এটা আমাদের পক্ষে অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্রই নয়, পরম মূঢ়তার নিদর্শনও বটে। কেননা, তাঁকে উপেক্ষা ক'রে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাস যে কোনো ক্রমেই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, এই সহজ সত্যটি আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আজো কি স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হয় নি? তা না হ'লে তাঁকে পাশ কাটিয়ে কেন আমরা চল্লিশের বহু প্রচারের ঢক্কা-নিনাদিত দু'একজন বিশেষ কবিকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে ও প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো?

এই বিষণ্ণ পটভূমিকায় ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে 'উত্তরসূরি' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করে আপনি একটি জাতীয় কৃত্য সম্পাদন করেছেন,

আলোচ্য সংখ্যাটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ ক'রে আমার তো তাই মনে হয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক যে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কে কিছু কিছু প্রবন্ধ ও আলোচনা নানা পত্র-পত্রিকায় ইতস্ততঃ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলো একান্ত-ভাবেই তাঁর কবিতা-সম্পর্কিত। আলোচ্য সংখ্যাটি অমিয় চক্রবর্তীর সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তাটিকে যেভাবে আমাদের মনের চোখের সামনে প্রোজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, মানুষ অমিয় চক্রবর্তীর অন্তরঙ্গ যে-ছবিটি তাঁর রচনার অনুরক্ত পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিয়েছে, তা' যেমন তথ্যাশ্রয়ী, তেমনি সম্পূর্ণ। বর্তমান সংখ্যাটি পাঠ ক'রে ব্যক্তিগতভাবে আমি যে কতোখানি উপকৃত হয়েছি, আমার সেই আনন্দানুভূতির কথা জানাবার জন্যই আপনাকে এই চিঠি লিখলাম। সমকালীন বাঙালি কবিদের অপক্ষপাতী মূল্যায়নের জন্য আপনার ঔৎসুক্য যে কতোখানি জাগ্রত, তা' লক্ষ্য ক'রে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও এই সুযোগে গভীরতর হ'লো।

আশা করি কুশলে আছেন। নমস্কার গ্রহণ করবেন।

ইতি
পরিমল চক্রবর্তী

[illegible] ভট্টাচার্য কর্তৃক [illegible] বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৬, থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত